শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু

স্মরণে

দিন আসবে

পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ

এই ভাই

ভিয়েতনামের কবিতা

ছেলে গেছে বনে

দিন আসবে

বছর দুই আগে আমি মস্কোতে একদিন মাদাম বাঁকোভার বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাদাম বাঁকোভা প্রাচ্যতত্ত্ব সংস্থায় বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করেন। বাংলা বলেনও চমৎকার। তাঁর স্বামী বুলগারীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। কথায় কথায় আমি নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। ভাপ্‌ৎসারভের নাম করতেই দেখলাম তাঁর চোখে-মুখে ভারি উৎসাহ ফুটে উঠল। বইয়ের তাক থেকে তক্ষুনি টেনে বার করলেন ভাপ্‌ৎসারভের কবিতার বই। তারপর মূল বুলগারীয় ভাষায় একটার পর একটা কবিতা পড়ে গেলেন। না বুঝলেও বেশ লাগছিল শুনতে। আমাদের সঙ্গে ছিল বরিস্। বরিস্‌ও ভালো বাংলা জানে, দু একটি কবিতা অনুবাদ করতে বলায় মাদাম বাঁকোভার স্বামী শব্দ প্রতিশব্দ বসিয়ে বসিয়ে খুব সাদামাটাভাবেও যা বললেন, বরিস আমাকে তার বাংলা ক'রে শোনাল। শুনে একটু অবাক হলাম। ইংরেজি অনুবাদে যে সব জায়গা খুব ফাঁকা লেগেছিল, বরিসের মুখে শুনে সে জায়গাগুলো অনেক বেশি সুন্দর লাগল। মাদাম বাঁকোভার স্বামীকে আমি জিগেস করলাম---আচ্ছা, রুশ অনুবাদে ভাপ্‌ৎসারভ কি আপনি পড়েছেন ? উনি বললেন পড়েন নি। ব'লেই রুশভাষায় লেখা একটা বই টেনে বার ক'রে বললেন, প'ড়ে দেখা যাক তো। তারপর দেখি

পড়তে পড়তে নিজের মনেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করছেন। শেষ পর্যন্ত বইটা সরিয়ে রেখে বললেন--কিচ্ছু হয় নি। কবিতার না ধরতে পেরেছে মানে, না ফোটাতে পেরেছে রস।

আর আমি? না করেছি ইংরেজির অনুবাদ। কথায় বলে, সাত নকলে আসল খাস্তা। কাজেই এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোনো কবিতা কিংবা কোনো কবিতার একাংশও যদি পাঠকের ভালো লাগে, তাহলেও অনুবাদক হিসেবে আমি খানিকটা সান্ত্বনা পাব। সত্যি বলতে কি, নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের জীবনই আমাকে তাঁর কবিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ভাপ্‌ৎসারভের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই :

পিরিন পাহাড়ের সানুদেশে ছোট শহর বানস্‌কো। সেখানে ১৯০৯ সালে নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের জন্ম। সেকালের তুলনায় নিকোলার মা এলেনা ভালোই লেখাপড়া জানতেন। লোক-সাহিত্য আর দেশবিদেশের কবিতা-চর্চায় তাঁর হাতেখড়ি মা-র কাছ থেকে। ছেলেবেলা থেকেই নিকোলা ছিলেন খুব মিশুক প্রকৃতির। আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর বই পড়ার নেশা। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই সহপাঠীদের নিয়ে থিয়েটার করা, দল গড়া—এসব বিষয়ে নিকোলার ছিল খুব উৎসাহ। যখন তিনি নৌ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন থেকেই জাহাজীদের সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। গোপনে বইপত্র পড়েন। একবার নিকটপ্রাচ্যে যান মালজাহাজে। তারপর পাশ ক'রে বেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে এক কাডবোর্ডের কারখানায় প্রথমে করতেন স্টকারের কাজ, পরে হন মেশিনচালক। নাটক, গান, সাহিত্যপাঠ, বক্তৃতা—এইসব ক'রে শ্রমিকদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করতেন। এই সময় শ্রমিক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কারখানার লোকজনদের মধ্যে তিনি সে সময়কার বুলগারীয় প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার প্রচলন করেন। ১৯৩৬ সালে কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে নিকোলা চলে আসেন সোফিয়ায়। বহু কষ্টে প্রথমে এক কারখানায়, পরে রেলে কাজ পেলেন আগওয়ালার। তারও পরে তাঁর কাজ জোটে সরকারী কশাইখানায় যন্ত্রকুশলী হিসেবে। যখন যেখানেই কাজ করেছেন, তাঁকে খাটতে হয়েছে শরীরের রক্ত জল

ক'রে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সমানে লিখেছেন। পড়াশুনো ক'রে কলমকে আরও ধারালো করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পার্টি থেকে নিকোলার ওপর পিরিন অঞ্চলে প্রচার অভিযান সংগঠিত করার ভার পড়ে। ধরা প'ড়ে নিকোলাকে সাজা খাটতে হয়। এরপর প্রতিরোধ আন্দোলনে নিকোলা হন অন্যতম নেতা। বুলগেরিয়ার তখনকার ফ্যাশিস্ট সরকার তাঁকে ধরাতে পেরে অকথ্য নির্যাতন করে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে টলাতে পারে নি। ১৯৪২ সালের ২৩শে জুলাই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে হাসিমুখে তিনি ফাঁসিতে প্রাণ দেন।

নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভ লিখেছেন সংগ্রামের কবিতা—যা তাঁর জীবন থেকে উঠেছে। তাঁর কবিতায় তাই নীরক্ত পাণ্ডুরতা নেই, প্রগল্‌ভ চিৎকার নেই। আছে যন্ত্রণার কথা, ভালবাসার কথা। আছে দাঁতে দাঁত দিয়ে সংগ্রামের কথা। আছে মানুষের অনিবার্য জয়ের কথা। অফুরন্ত আশার কথা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যাবার আগে

ঘুমুলে তোমাকে দেব মাঝে মাঝে
হঠাৎ দেখা।
দিও না দরজা। বাইরে রেখো না
আমাকে একা।

আঁধারে তোমাকে নীরবে দেখব
নয়ন ভ'রে।
বিদায়ের আগে এঁকে দেব চুমো
ভুই অধরে॥

কারখানা

নিচে কারখানা।
আকাশে মেঘের মত ধোঁয়া।
লোকগুলো সাদাসিদে
একঘেয়ে বেয়াড়া জীবন।
মুখোস পড়েছে খসে',
রং গেছে চটে'—
জীবনকে মনে হয়
যেন দাঁত-খিঁচোনো কুকুর।

কিছুতে ছেড়ো না হাল, লেগে থাকো—
নেই দম ফেলবার সময়।
লোম খাড়া করে আছে
ক্রুদ্ধ জানোয়ার—
দাঁত থেকে তার
তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে হবে।

চাকায় জড়ানো বেল্ট ঠাস্ ঠাস্ শব্দ করে,
ক্যাঁচর কোঁচর শব্দে
মাথার উপরে শ্যাফ্‌ট্ ঘোরে।
বদ্ধ ঘরে খেলে না বাতাস,
বুক ভ'রে
মেলে না নিশ্বাস।

বাইরে তাকিয়ে দেখ,
বসন্তের হাওয়া
দোলায় মাঠের ধান,
হাতছানি দিয়ে ডাকে রোদ,
আকাশে হেলান দিয়ে গাছ
ছায়া ফেলে
কারখানা-প্রাচীরে।

অনাদরে দূরে ঠেলা
আদিগন্ত মাঠ—
কোনদিন কি ছিল চেনা ?
মনেও পড়ে না।
আকাশ নিক্ষিপ্ত হল আঁস্তাকুড়ে,
স্বপ্ন ছিল—
তাও।
কেননা তোমার চোখ
যন্ত্রে থাকবে আঁটা,
মন উড়ু-উড়ু হলে মুহূর্তের ভুলে
হাত যাবে উড়ে।

চিৎকারে ডোবাতে যদি পারো
যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দ,

যদি তুমি তুলতে পারো গলা
মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে—
তাহলে শোনাতে পারো কথা।
তারস্বরে আমার চিৎকার
সেই কবে থেকে —
অনাদি অনন্তকাল ধ'রে।...
কারখানা,
কলকব্জা
এবং দূরের ঐ
অন্ধকার ঘুপ্‌চির মানুষ —
শুনেছি সবাই নাকি সমস্বরে ক'রেছে চিৎকার।
এ চিৎকারে তৈরি হওয়া ইস্পাতের পাতে
আমাদের হাতে
কঠিন দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত জীবন।
এই যজ্ঞে একবার বাধা দিয়ে দেখ—
আগুনে নিজের হাত নিজেই পোড়াবে।

হে কারখানা!
আমাদের চোখ বুঝি বেঁধে দিতে চাও
ধোঁয়া আর ঝুলকালি দিয়ে?
বৃথা চেষ্টা!
কারণ, তোমারই কাছে
শিখেছি সংগ্রাম করতে।
আমরাই এ মাটিতে
ডেকে এনে বসাব সূর্যকে।

খেটে খেটে কত লোক হাড় কালি ক'রে
তোমার শাসনে জ্বলে পোড়ে;
সহস্র বক্ষের হৃদ্‌স্পন্দনে তবুও
দেখি তালে তাল দেয়
তোমার হৃদয়॥

ছবিঘর

দরজায় ভিড় খুব,
আলো প'ড়ে
দেয়ালে জল্‌জল্‌ করছে পোস্টার।
হরফগুলো
বড় গলায় বুক ফুলিয়ে বলছে :
'এস, দেখ মানুষের জীবননাট্য'।
দরজায় ভিড় খুব।
আর আমার হাতের চেষ্টায়
ঘেমে নেয়ে উঠছে
নিকেলের ওপর ছাপা রাজার মুখ

অন্ধকার হলে
শাদা চৌরস পর্দায়
ঘুম ঘুম চোখে হাই তোলে
মেট্রোগোল্ডউইনের সিংহ।
তারপর হুম ক'রে একটা রাস্তা,
রাস্তার দুপাশে জঙ্গল
আর মাথার ওপর যত দূর দেখা যায়,
নীল তকতকে আকাশ।

রাস্তার ঠিক বাঁকের মুখে
কলিশন হয়
চিকন চিকন দুটি গাড়িতে।
একটিতে আমাদের নায়ক
আরেকটিতে নায়িকা।
ভদ্রলোক
তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে

কাঠ-কাঠ হাতে
ভদ্রমহিলাকে যন্ত্রবৎ কোলে তুলে নেন।
ধোঁয়া-ধোঁয়া দৃষ্টিতে
ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে চোখ মেলেন,
চোখের পাতাদুটো থর থর ক'রে কাঁপে।
তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে।
হায় হায়!
রূপ যেন সারা অঙ্গে ফেটে বেরোচ্ছে।

গাছের ডালে ব'সে
কোকিলের গান থাকতেই হবে,
পাতার ফাঁক দিয়ে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে নিথর নীলিমা,
আর কাছেই কোমল তৃণশয্যা
থেকে থেকে চোখ টিপে ডাকবে।

তেল-চকচকে জল
গ্রেটার মুখে চক্ চক্ ক'রে চুমো খেল।
তার কামুক ঠোঁটে ফুটে উঠল
লোলুপ লালসা।...

বাস্, বাস—
খেল্ খতম্ করো, থামো
এর কোন্ জায়গায় আমাদের জীবন?
কোথায় নাটক?
আমি এর কোন্ জায়গাটায় আছি বলো
আমার মেরুদণ্ড গুলিভরা বন্দুকের নল ছুঁইয়ে রেখেছে
বিস্ফোরক সময়।

আমাদের বুকের ভেতরটা ধোঁয়ায় ভর্তি,
আমাদের ফুসফুসে যক্ষ্মা—
প্রেমেই পড়ি
আর বিপদেই পড়ি
গোবরগণেশ হওয়া আমাদের কুষ্টিতে লেখে নি।

আমরা কি চিকন চিকন গাড়িতে ক'রে যাই
মনের মানুষের সঙ্গে
মিলতে ?

আকণ্ঠ ধোঁয়ার মধ্যে
ঝুলকালি মেখে
যন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে
যখন আমরা কাজ করি—
আমাদের জীবনে
ভালবাসা তখনই জাগে।

তারপর আসে বিবর্ণ জীবন,
টিঁকে থাকার জন্যে সংগ্রাম,
ভাসাভাসা অস্পষ্ট স্বপ্ন—
রোজ রাত্রে ছেঁড়া মাদুরে একপাশে এককাত হয়ে শুয়ে
নিজের অজান্তে
আস্তে আস্তে বিছানার সঙ্গে মিশে যাই
তারপর মরি।

জীবনের এই হল চেহারা ;
নাটক যা
তা এরই মধ্যে।
আর যা কিছুই বলো—
সব মিথ্যে ॥

বাড়ি তুলব

গেঁথে তুলব আমরা এক ইমারত, প্রকাণ্ড বিশাল একটা বাড়ি।
বাড়ির দেয়াল হবে কংক্রিটের।
ইস্পাতের কড়িকাঠে তৈরি হবে বাড়ির কাঠামো।
আমরা যারা সাধারণ লোক
মেয়ে ও পুরুষ হাত ধরাধরি ক'রে
গড়ে তুলব বাড়ি—
মহানন্দে বাসা বাঁধবে সেখানে জীবন।

থাকি আমরা দম-বন্ধ করা
খোলার বস্তিতে।
আমাদের ছেলেপুলেগুলো
দেখতে পায় না রোদ্দুরের মুখ,
অকালে হারায় প্রাণ বিষাক্ত হাওয়ায় শ্বাস টেনে।
এ পৃথিবী বন্দীশালা।
ক্ষেতে-কলে কাজ-করা
হে আমার দেশের মানুষ,
থামো! আর কিছুতেই নয়।
এসো আমরা গড়ি সেই বাড়ি—
জীবন যেখানে বাঁধবে বাসা।

আমাদের ছেলেপুলেগুলো
অন্ধকার ঘরে
দুর্গন্ধে নিশ্বাস আটকে মরে।
আর আমরা কী নির্লজ্জ! কিছুই বলি না—
নিষ্ঠুর ক্লীবত্বে থাকি বুকে হাঁটু গুঁজে।
বিদ্যুৎকে তারে বেঁধে কে পাঠালো?
সেও তো আমরাই—
আমাদের রক্ত সেই তার বেয়ে

জীবনে জোগায় শক্তি। জীবনই আবার
আমাদের ঠেলে ফেলে! হেঁচড়ে হেঁচড়ে নিয়ে যায় টেনে—
        আমরা বোবার মত শুধু চেয়ে থাকি।
পাথরে বিঁধিয়ে নখ—গ্রানিট্ পাথরে
        আমরা সুড়ঙ্গ খুঁজি পাহাড়ের গায়ে।
আমরা ঘিরেছি সারা পৃথিবীকে ইস্পাতের রেলে,
আমরা রাখি পৃথিবীর পেটের খবর
      ভূগর্ভের গুপ্তধন আমাদের জানা।
আকাশের গায়ে এরিয়ালে
          ফুটে আছে রেখাচিত্র
        শান্ত স্কাইস্ক্রেপারের চূড়া
                বাড়ায় মেঘের রাজ্যে গলা,
আরো ঊর্ধ্বে
সমানে গর্জায় কালো ইস্পাতের পাখি।

ভাইবন্ধু, সাথীবৃন্দ!
আমাকে বুঝো না যেন ভুল:
আমার বিচারে জেনো অপরাধী নয়
        এ যন্ত্রসভ্যতা।
আমি জানি বিলক্ষণ
এ প্রগতি আমাদের টুঁটি টিপে নেই।
গায়ে তার দেব না আমরা হাত।
        আমরা গড়ে তুলব বাড়ি।
                প্রকাণ্ড বিশাল একটা বাড়ি।
বাড়ির দেয়াল হবে কংক্রিটের,
ইস্পাতের কড়িকাঠে তৈরি হবে বাড়ির কাঠামো
আমরা যারা সাধারণ লোক,
      মেয়ে ও পুরুষে হাত ধরাধরি ক'রে
          গড়ে তুলব বাড়ি—
                মহানন্দে বাসা বাঁধবে সেখানে জীবন॥

একটি চিঠি

মনে পড়ে তোমার
সেই সমুদ্র ?
যন্ত্রের সেই ঘর্ঘর ?
আর উপকূলবাহী সেই জাহাজের
        স্যাৎসেঁতে অন্ধকার খোল ?
তখন আমরা পাগলের মত খুঁজছি—
        কই, কোথায় ফিলিপাইনের তটরেখা ?
ক্যামাগুস্তার মাথার ওপর
        কই, কোথায় সেই তারার ঝাঁক ?
এক জাহাজ লোক দূরদিগন্তের দিকে
        ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে—
আস্তে আস্তে নিভে আসছে দিনের আলো—
গায়ে এসে লাগছে গ্রীষ্মমণ্ডলের মৃদুমন্দ হাওয়া।
        তোমার মনে আছে ?
        তারপর একে একে সমস্ত আশা
                শূন্যে মিলিয়ে গেল।
        সদ্গুণে
                আর মনুষ্যত্বে
        দৈবে
                আর দিবাস্বপ্নে
ভেতরকার বিশ্বাস বলতে কিছুই আর
আমাদের রইল না।
মনে আছে ?   কি রকম অতর্কিতভাবে
        আমরা ধরা পড়েছিলাম জীবনের ফাঁদে ?
                আমাদের আক্কেল হল
                        ঢের পরে।

নিষ্ঠুরভাবে আমাদের হাত-পা তখন বাঁধা
খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মত
আমাদের সতৃষ্ণ নয়নে
ঝিলিক দিচ্ছিল তখন কাতর প্রার্থনা
তখন আমরা কী ছেলেমানুষই না ছিলাম!
কী ছেলেমানুষ!…

কিন্তু…তারপর এক সময়ে
দুষ্ট ক্ষতের মত,
না, না, কুষ্ঠের মত
সব কিছু পচিয়ে খসিয়ে দিয়ে
আমাদের মনের মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিল ঘৃণা।
তারপর সেই ঘৃণা বুনে চলল
শত্রুগাঁড় হতাশার নিষ্ঠুর জাল।

আর রক্তের মধ্যে বুকে হেঁটে চলল
তার পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা ভয়।
কবেকার, সেই কোন্ কবেকার কথা সে সব।…
তখনও
মাথার ওপর চাঁদের হাট বসিয়ে
জেলেতুলে হাওয়ায় ভাসত সিন্ধুশকুনের দল
তখনও স্ফটিকের মত
ঝলমলে ছিল আকাশ
আর শূন্যতা ছিল সীমাহীন নীল।
সন্ধ্যা নাগাদ
দিগন্তে বিলীন হত শুভ্র পাল
আর মাস্তুলগুলো মিলিয়ে যেত কোথায়
সেই কোন্ দূরে।
কিন্তু সে সব দেখব কী, আমাদের চোখ তখন অন্ধ।
আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে সেই অতীত,

আজ তার কোন দাম নেই—
তুমি আর আমি
একদিন আমরা ছিলাম একই জীবনের শরিক।

তাই আমার বিশ্বাসের কথা
তোমাকে আমি না বলে পারছি না ;
কেন আজ মনে আমার এত সুখ—
আমি না ব'লে পারছি না।
আমার কপাল আমি ঠুকে ঠুকে ভাঙি নি—
নতুন জীবনই আমাকে ঠেকিয়েছে ;
আর আমার অন্তর্জ্বালাকে রূপান্তরিত করেছে
আজকের সংগ্রামে।
এই নতুন জীবনই ফিরিয়ে আনবে ফিলিপাইনের তটরেখা,
ফামাগুস্তার মাথার ওপর ফুটিয়ে তুলবে নক্ষত্রের ঝাঁক—
আবার আমরা ফিরে পাব সেই আনন্দ
আমাদের বুকের মধ্যে যা ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

কলকাতার প্রতি
সমুদ্রের অন্তহীন নীলিমার প্রতি
আর গ্রীষ্মগুলের মৃদুমন্দ হাওয়ার প্রতি
আমাদের যে ভালবাসা একদিন মরে গিয়েছিল
সে ভালবাসা আবার প্রাণ পাবে।

এখন অন্ধকার।
ইঞ্জিনের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দে
সামনে ঠেলছে
উষ্ণ নিশ্বাস।
আলেয়ার আলো আমার কী অসহ্য,
যদি জানতে—

যদি জানতে
কী গভীরভাবে আমি ভালবাসি জীবনকে !
আমাদের মাথার চাড়ে খান্ খান্ হবে বরফ
—রাত্রির পর প্রভাতের মতই
আমি জানি, তা না হয়ে পারে না।
যেখানে চেঁট হয়ে আছে অন্ধকার দিগন্ত
সেখান থেকে সূর্য—

আমাদের, হ্যাঁ, আমাদেরই
রাঙা টুকটুকে
সূর্য
উঠে আসবে
ছোট্ট প্রজাপতির মতই
তার ঝাঁঝালো আলোয়
পাখা আমার পুড়ে যায় যাক,
আমি মুখ বুজে থাকব,
কেননা আমি জানি,
শত অভিশাপ শত অভিযোগেও
আমার মৃত্যু রদ হবে না

পৃথিবী যখন তার গা থেকে
অন্যায়ের ধুলোকাদা
সব ঝেড়ে ফেলেছে
যখন নবজন্ম হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের,
ঠিক তখনই মৃত্যুকে বরণ করা
গানের মত—

হ্যাঁ, গানই তো॥

গ্রামবার্তা

রেডিওতে কে একজন
মেলাই তড়পাচ্ছে।
কাকে বোঝাচ্ছে, হে ?

আমি জানি না।
তবে বোধহয়—দেশের পাঁচজনকে।

বকতে দাও,
ওকে তো বকবার জন্যেই
মাইনে দিয়ে রেখেছে।

'আপনাদের ভালোর জন্যেই
সরকার বাহাদুরের
ফৌজসিপাহী সব তৈরি—
এখন শুধু হুকুমের ওয়াস্তা।

'নিপাত যাক শ্লোগান !
ফেলে দিন নিশান !

'ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান
গোয়ালভরা গরু—
সুখের অন্ত নেই।'

কফিখানায় একজন লোক
আর থাকতে না পেরে থুথু ফেলল।
পা দিয়ে থুথুটাকে ধুলোর ওপর বেশ মাড়িয়ে দিল

তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে
বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল :

'ভেবেছে হারামজাদারা আমাদের ওপর
খুব চাল চালবে।
আমরা সেই বান্দা কিনা!
ভগবান তো নিজের মুখেই বলেছেন—
দশের কথাই ভগবানের কথা।'
ক্ষিদেয় ভেঁচকানি-লাগা এক ছোকরা
দাঁতে ছি-ছি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বলল :

'ঠিক বলেছেন,
উনিশ শো পনেরো সালেও
ঐ একই মিথ্যে কথা আপনাদের বলেছিল না?

'তবে আজ এসে ওরা যদি
আমাদের মরতে বলে,
যদি বাধ্য করে
গুলির সামনে বুক পেতে দিতে—
তাহলে, যার মাথায় গোবর পোরা
সেও স্বীকার করবে—
সময় এসেছে
এবার আমাদের যা বলবার আছে বলব।

'আমাদের রুটি
আমাদের পোড়া কপালের চেয়েও কালো,
আমাদের তেলের পাত্রে
একফোঁটাও তেল নেই।

'সুতরাং আমি মনে করি,
আমাদের একটাই শ্লোগান—
দমনরাজ নিপাত যাক!
সোভিয়েতের হাতে হাত মিলাও!'

মানব-বন্দনা

দুজনে তুমুল তর্ক,
এক ভদ্রমহিলা আর আমি।
কথাটা উঠেছিল
একালের মানুষ নিয়ে।

ভদ্রমহিলার
রণচণ্ডী তিরিক্ষি মেজাজ,
আমি শেষ না করতেই
মাটিতে দুমদুম ক'রে পা ঠুকে
তিনি জবাব দিচ্ছিলেন,
বোঝা মুস্কিল হচ্ছিল তাঁর নালিশটা ঠিক কী,
তাঁর মুখের সামনে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না।

আমি বলে উঠলাম, 'দাঁড়ান ! এই যে দেখছেন…'
কিন্তু আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই
রেগেমেগে তিনি বললেন,
'দোহাই আপনার, চুপ করুন তো !
আমি বলছি—মানুষকে আমি ঘেন্না করি
আপনার যুক্তিগুলো আপনি অপাত্রে ঢালছেন।

'কাগজে পড়েছিলাম
একজন লোক দা দিয়ে
তার নিজের ভাইকে
কুপিয়ে মেরেছিল।
তারপর ধোপদুরস্ত হয়ে গির্জায় গিয়েছিল
প্রার্থনা করতে
তাতে সে বেশ হালকা বোধ করেছিল,
একথা সে পরে বলেছে।'

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল,
কেমন যেন দমে গেলাম।
সরল মনে আমি ভেবে দেখলাম,
বই-পড়া বিদ্যেয়
আমার তেমন দখল নেই,
তারচেয়ে একটা ঘটনার কথা
ধরা যাক।

মোগিলা ব'লে এক গ্রাম—
ঘটনাটা সেখানেই ঘটেছিল।
বাপের ছিল
কিছু লুকোনো টাকা।
ছেলে জানতে পেরে
জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছিল
তারপর খুনখুন করেছিল বাপকে।

কিন্তু মাসেক কাল কি
সপ্তাহখানেক পরে
ছেলেটা ধরা পড়ল।
আদালত জায়গাটা
কারো মামার বাড়ি নয়—
বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হল।
তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল
কয়েদখানায়,
সেখানে তাকে দেওয়া হল,
নম্বর-মারা চাকতি আর লোহার সান্কি।
কিন্তু সেই জেলখানাতেই
অকপট সাচ্চা মানুষের
সে দেখা পেল।

একদিন কোন্ যাদুস্পর্শে
সে বদ্‌লে গেল জানি না,
জানি না
কোথা দিয়ে কী হল।
ব'কে ব'কে মুখে ফেনা তুলেও যা হয় নি—
তা সম্ভব হল গানের ভেতর দিয়ে।
একটি গানই তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল
তার নিয়তির নির্বন্ধ।
পেটে যখন দানা নেই
অভাবে মাথা যখন ঝিমঝিম করছে
একটি ভুল পদক্ষেপ হলেই
তুমি ডুবেছ।
'বলীবর্দের মত
এখন তুমি বলির অপেক্ষায়,
যেদিকেই তাকাও,
তোমার চোখের সামনে নাচছে কশাইয়ের ছুরি।
জগৎটার এমনই লক্ষ্মীছাড়ার দশা,
জীবনটা বদ্‌লে গেলে বেশ হত…'

ব'লে সে আস্তে আস্তে
চাপা গলায়
গান ধরল।
তার সামনে মিষ্টি স্বপ্নের মত ভাসতে লাগল
জীবন।…
গান গাইতে গাইতে
স্মিতমুখে
সে ঘুমিয়ে পড়ল।…

বাইরে গলিতে কারা যেন
ফিস্ ফিস্ ক'রে কী বলল।

এক মুহূর্তে সব চুপ।
তারপর খুব সন্তর্পণে কে যেন দরজা খুলল।
জনকয়েক লোক। পেছনে জেলের একজন সেপাই।

তাদের মধ্যে একজন
বাজ্‌খাই গলায়
চেঁচিয়ে বলল—
'ওহে চাঁদ, এবার উঠে পড়ো।'
অন্য যারা সঙ্গে এসেছিল
তারা ফ্যাকাসে দেয়ালটার দিকে মুখ ফিরিয়ে
ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

যে লোকটা এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল
সে বুঝতে পারল
তার আয়ু শেষ হয়ে গেছে।
অমনি সে তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল,
তারপর কপালের ঘাম মুছে,
বন্য বলদের মত
ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আস্তে আস্তে
লোকটার হুঁশ হল—
ভয় ক'রে কোন লাভ নেই
মরতে তাকে হবেই.
এক আশ্চর্য আলোয়
তার আত্মা উদ্ভাসিত হল।
'তাহলে রওনা হওয়া যাক, কী বলো?'
তার কথায় সকলে সায় দিল।

চলতে লাগল সে
বাকি সবাই তার পেছনে।

কী একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায়
তাদের গা
সিরসির করছে।
সেপাইটি তার মনকে এই ব'লে চোখ ঠারল,
'ব্যাপারটা এখন সুভালাভালি চুকে গেলেই হয়।'
বাছাধন, পালাবে কোথায় ?

বাইরের গলিতে
ওরা চাপা গলায় কথা বলছে।
আনাচে কানাচে ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার।
হাঁটতে হাঁটতে তারা উঠোনে এসে পৌছুল।
তখন মাথার ওপর
আকাশ আলো ক'রে ফুটছে নতুন সকাল।

লোকটা দেখল সকাল হচ্ছে,
দেখল আকাশে আলোর ঝর্ণাধারায়
স্নান করেছে একটি নক্ষত্র
আর সেইসঙ্গে মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলল
মানুষ হিসেবে তার
মারাত্মক
হিংস্র
অন্ধ
নিয়তি।

'আমার দিন ফুরিয়েছে,
এবার ফাঁসির দড়িতে ঝুলব।
তবু আমি বলব
এটাই শেষ নয়।

কেননা, এখানে জন্ম নেবে
গানের চেয়েও মধুর
ফাল্গুনের দিনের চেয়েও সুন্দর
একটি জীবন।...'

গানটার কথা মনে হতেই
কী একটা ভাবনার ঝিলিক খেলে গেল—
(তার চোখদুটো আগে থেকেই হাসছিল।
সারা মুখ এবার প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হল;
বুক টান ক'রে সে গাইতে শুরু ক'রে দিল:

এবার বলুন, আপনি এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?
হয়ত বলবেন—
লোকটার হিস্টিরিয়ার ব্যামো,
মানসিক বিকারে ভুগছিল।
নিজের মর্জিমত যা'হোক একটা কিছু খাড়া করতে পারেন—
কিন্তু না ব'লে পারছি না,
আপনি ভুল করছেন।

লোকটা এমন শান্তভাবে
এমন জলদগম্ভীর স্বরে
একটি একটি ক'রে
গানের কলি গেয়ে যাচ্ছিল
যে,

ওরা সব হাঁ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে রইল
আর দুরু দুরু বুকে কড়া নজর রাখল
চোখে ধুলো দিয়ে যেন পালাতে না পারে।
গোটা কয়েদখানাটাই
থরহরি কম্পমান হচ্ছিল ভয়ে,

অন্ধকার ত্রাহি ত্রাহি রবে
পালাচ্ছিল।
আকাশের তারাগুলো মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে
তারস্বরে
লোকটার জয়ধ্বনি দিচ্ছিল :
'সাবাস ভাই, বীর বটে।'

শেষটা জলের মত সহজ।
দড়িটা যেভাবে কাঁধের ওপর এসে পড়ল
তাতে পাকা হাতের ছাপ বোঝা যায়।
তারপরই মৃত্যু।
কিন্তু তখনও তার ব্যথায় বিকৃত
রক্তহীন নীল ঠোঁটে
গানের সেই কলিগুলো যেন লেগে রয়েছে।

এবার আমরা চলে এলাম শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে।
হে আমার পাঠকপাঠিকা,
আপনারাই বা কী মনে করেন ?

এদিকে তো সেই ভদ্রমহিলা
ফোঁপাতে শুরু ক'রে দিয়েছেন,
এক সময় হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি চেঁচাতে লাগলেন

'কী ভয়ের কথা ! ইস্ কী সাংঘাতিক !
আপনি এমনভাবে সব বলছেন
যেন নিজের চোখে দেখা !...'

এর মধ্যে ভয়ের কী আছে ?
একটা লোক একটা গান গেয়েছিল—
সুন্দর একটা গান।
তাই না ?

গর্কী

আমি কাজ করতাম এক কারখানায়
মাথার ওপর নিচু হয়ে ঝুলে থাকত
ঝুলমাখা আকাশ।
লোহাবাঁধানো থাবা দিয়ে
সেখানে আমাদের মেরে মেরে পাট করত
জীবন,
আর হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে
আমাদের কপালে ফেলত
বলিরেখা।

মানুষগুলোর মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাতে,
যে মিথ্যেগুলো
জমে জমে
জগদ্দল পাথর হয়ে
তাদের বুকের ওপর
চেপে বসেছিল
সেই পাথর ভাঙতে
আমাদের কী সংগ্রামই না করতে হয়েছিল।

আমি কাজ করতাম এক কারখানায়
মাথার ওপর নিচু হয়ে ঝুলে থাকত
ঝুলমাখা
আকাশ,
সেখানে জীবন আমাদের মেরে মেরে পাট করত
আর দিনগুলো
মরচে-ধরা পেরেকের মত—
আমাদের মনগুলোকে এঁটে ধরত।

কিন্তু আমার মনে পড়ে, যখনই আমরা পড়তাম
'নিচুতলা'
কিংবা
'মা'

অমনি কারখানার তেলচিটে ছাদ ফুঁড়ে
দেখা দিত সূর্য—
আর আমাদের চোখগুলো
চকচক ক'রে উঠত।

এঁদো গলিতে থাকা বস্তির মানুষগুলো
ঘষে ঘষে তুলে ফেলত
চিন্তার মরচে,
খুশি হত,
তারা কী খুশিই যে হত।...
আজ সকালে
আগওয়ালা এসে বলল :
'ভাপ্‌সারভ'
স্টীম সব শেষ!'
আমি চমকে উঠে
তার চোখের দিকে তাকালাম।
গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে সে
উপরতলায় চলে গেল।

তারপরই ঝড়ের বেগে এসে ঢুকল
লোহাদরের মিস্ত্রি,
উত্তেজিত হয়ে জিগ্যেস করল :
'তুমি কিছু জানো?'—তার গলা আরও চড়ল—
'বুড়োর মরবার খবরটা সত্যি?'
আমার হাতপা হিম হয়ে গেল,
হঠাৎ মুখ বিষ ক'রে বললাম :

থাক,
আর দাঁত বার করতে হবে না।
ঠিক ক'রে বলো।
কে মারা গেছে ?'
নামটা শোনামাত্র আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম
ইঞ্জিন রুমের হাওয়ায়
আমার দম আটকে আসছিল।
ঘরের মধ্যে জায়গা হচ্ছিল না
আমার বেদনার।
তার স্বরের সঙ্গে
আমার স্বর মিলছিল না।

আমার কানে এল
লোহাঘরের মিস্ত্রি কাকে যেন নিচু গলায় বলছে :
'ভায়া, কী নিখুঁতভাবে গর্কী আমাদের জানতেন—
আমাকে, তোমাকে, আমাদের সবাইকে।
তিনি তোমাকে তাঁর কোন বইতে তুলে ধ'রে
বলবেন : এখান থেকে নড়তে পারবেনা।
তারপর তুমি পড়ে দেখ,
অবাক হয়ে যাবে
বইতে রয়েছ অবিকল তুমি।

'কিংবা ধরো,
ঘরে তোমার কচি ছেলে।
সে পড়ছে
পড়ছে না ব'লে বলা যায়—বই হাতড়াচ্ছে।
তোমার পয়সা নেই।
ধরো,
তোমার হাত খালি।

উনি বলবেন :   নিশ্চয়,

শিশুরা যা মন চায়

তাই পড়বে।

‘মনে করো

বুকভরা জ্বালাযন্ত্রণা নিয়ে

তুমি বাড়ি ফিরলে,

আর সেই চাপা রাগ ফেটে পড়ল তোমার স্ত্রীর ওপর।

মুখ তুলে

ভুরুর নিচে দিয়ে

তোমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে

উনি জিজ্ঞেস করবেন :

কী, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় বুঝি ?’…

মিস্ত্রি যাকে বলছিল

সে মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে।

জীবনের বন্ধ দুয়ার

যেন হঠাৎ তার সামনে

হাট হয়ে খুলে গেল,

বরফের সে শক্ত ডেলাটা

এতক্ষণ তার বুকে আটকে ছিল,

যেন মন্ত্রবলে সেটা মিলিয়ে গেল—

এখন তার কাছে

সমস্তই জলের মত পরিষ্কার।

আস্তে, খুব আস্তে শোনা গেল

সে বলছে :

‘হ্যাঁ, একেই বলব সত্যিকারের মানুষ।’

স্পেন

কী ছিলে তুমি আমার কাছে ?

কিছুই নয়
দূরের এক ভুলে-যাওয়া ভূখণ্ড,
অশ্বারোহী মল্লের
আর অভ্রভেদী মালভূমির দেশ।

কী ছিলে আমার কাছে ?

তুমি সেই দেশ, যার মাটিতে ছিল
ঘর-জ্বালানো পর-ভোলানো এক নিষ্ঠুর ভালবাসা,
উষ্ণ রক্তে নেচে যেখানে নেশার মত্ততা,
অসিতে অসি লেগে ফুলকি।
যে দেশে ছিল
বাতায়নতলে প্রেমাকাঙ্ক্ষীর নৈশ গীতবাদ্য,
ছিল ক্রোধ, ভালবাসা।
ঈর্ষা
ছিল উপাসনার স্তোত্র।

এখন তুমি নিয়তি আমার,
তোমার মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে জড়ানো
আমার জীবন, আমার ভূতভবিষ্যৎ।
আর কিছুতেই আলাদা হব না।

তোমার প্রত্যেকটি যুদ্ধজয়ে
আমি উদ্দীপ্ত হই, আনন্দে উৎসব করি।
আমার অটুট আস্থা তোমার যৌবনে, তোমার শক্তিমত্তায়
তোমার বাহুবলে মেলাই আমার বাহুবল।

তোলেদোর রাস্তায় রাস্তায়
মাদ্রিদের শহরতলীতে
মেশিনগানের ছাউনিতে ছাউনিতে
জয়ের লক্ষ্যে দাঁড় গুঁজে আমি লড়ছি।

গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে অদূরে প'ড়ে রয়েছে
সুতীর শার্ট গায়ে-দেওয়া এক মজুর।
চোখের ওপর টেনে দেওয়া তার টুপিটা থেকে
অনর্গল গড়িয়ে পড়ছে উষ্ণ রক্ত।

তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই
চম্‌কে উঠলাম। লোকটা আমার বিশেষ চেনা
একটা সময়ে একই কারখানায়
আমরা কাজ করেছি।

আমাদের কাজ ছিল চুল্লীর আগুন
খুঁচিয়ে গন্‌গনে ক'রে তোলা।
আমাদের কাঁচা বয়সের স্পর্ধিত বাসনার সামনে
বাধা বলতে কিছুই ছিল না।

লোকটাকে হঠাৎ চিনতে পেরে
ধমনীতে আমার
নিজেরই রক্ত গুঞ্জন ক'রে উঠল।

ঘুমাও, যুদ্ধের সাথী আমার! শান্তিতে ঘুমাও।
রক্তরাঙা নিশান আজ গোটানো থাক—
তবু আমার ধমনী বেয়ে তোমার রক্ত
একদিন সারা পৃথিবীর মানুষকে নাড়া দেবে।

গ্রামে কারখানায় শহরে রাজ্যময়
তোমার রক্তের ঢেউ গিয়ে লাগছে ;
ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে কানে কানে মন্ত্র দিচ্ছে,
উৎসাহের বান ডাকিয়ে বলছে : দেখিয়ে দাও—

মজুরের জাত কখনও দমবার পাত্র নয়—
তারা এগিয়ে যাবে, কারো সাধ্য নেই ঠেকায়।
বুক বেঁধে তারা কাজ করবে, তারা লড়বে ,
রক্ত ঢালবে মানুষ যাতে স্বাধীন হয়।

আজ তোমার রক্তে উঠছে প্রতিরোধের দেয়াল,
আমরা সাহসে বেঁধে নিচ্ছি আমাদের বুক
আর বেপরোয়া উল্লাসে ঘোষণা করছি—
'মাদ্রিদ্ আমাদের :
আমাদেরই মাদ্রিদ !'

বন্ধু, তুমি ভাবনা ক'রো না···
দুনিয়া আমাদের।
এই বিস্ফারিত বিশ্বজগৎ
আমাদেরই !
বিশ্বাস রাখো, আমাদের ভরসা করো
দক্ষিণের এই আকাশের তলায়
তুমি শান্তিতে ঘুমাও ॥

দ্বৈরথ

হাত আমাদের ধরা
শক্ত পাঞ্জায়।
আমার হৃদ্‌পিণ্ড থেকে
চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত,
আর ক্ষয় হচ্ছে তোমার শক্তি।
তারপর ?
তারপর আর কী—
একজন হেরে ঢোল হবে, চিৎপটাং হয়ে পড়বে
মাটিতে।
সে একজন হলে
তুমি।

বিশ্বাস হয় না ? ভয় নেই বুঝি ?
জেনে রাখো,
পর পর প্রত্যেকটা চাল আমার ভাবা।
আমার বাহুতে বল দিচ্ছে
আমার হৃদয়।
ক্রূর নৃশংস, হে জীবন—
তুমি হারবে।

এই আমরা প্রথম লড়ছি না, তুমি জানো।
সেই কবে শুরু হয়েছে আমাদের দ্বৈরথ—
তারপর কত দিন,
কত দীর্ঘদিন ধ'রে মরীয়া হয়ে আমরা লড়েছি
আমাদের হাত
ধরা থেকেছে পাঞ্জায়।
তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাতের হিংস্র আঘাত
আমি কখনই ভুলব না।

খনিতে প্রচণ্ড শব্দে গ্যাসের বিস্ফোরণ হল,
মাথার ওপরে
স্তবকে স্তবকে কয়লা ভেঙে
চাপা পড়ল পনেরোটা মানুষ।
পনেরো জন
জীবন্ত
কবর।
তার একজন
আমি।

কুলিবস্তির একটা ঘরের সামনে
পড়ে রয়েছে বন্দুক।
তার নলের মুখে ধোঁয়া তখনও লেগে।
শবদেহটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছে।

কোন চেঁচামেচি নেই,
কোন সে [illegible] নেই
একটি বুলেট, ব্যস!
তারপর—[illegible] ময়লা
মনে হয় খুনটা যেন কিছুই নয়…

লড়াই নেই,
বাঁচার ব্যগ্রতা নেই,
নেই ছটফট করা।

জানো তুমি
সে কে?
সে হল
আমি

বৃষ্টির জলে ধোয়া ফুটপাথে,
একজন মুখ থুবড়ে প'ড়ে।
গুলি এসে লেগেছিল আড়াল থেকে।
বারুদ-ঠাসা আকাশটা যেন
চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ল চৌমাথার চকে।

সেখানে রক্তে ভাসছে
ঐ যে লোকটা--
আমারই ভাই সে,
তার নিষ্পলক চকচকে চোখে
ভালবাসা আর ঘৃণার
আগুন।

তার আততায়ী
ঘৃণিত সেই দুর্বৃত্ত
দেখতে না দেখতে
হাওয়া হয়ে গেল।
সেই খুনী বদমাশটাকে তোমার মনে আছে?
সে
আমি।

পারীর ব্যারিকেডে যে শিশুটি প্রাণ দিয়েছিল
তাকে মনে পড়ে?
মৃত্যু বরণ করেছিল সে
কালান্তক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে
তার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত
আস্তে আস্তে
ইস্পাতের মত ঠাণ্ডা হল।
তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে

তখন তখন ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল
একটুখানি হাসি।

ঠোঁট নীল হলেও
তখনও তার চোখ
উৎসাহে জ্বলজ্বল্ করছিল,
তার চোখ যেন গাইছিল,
'লিবার্তে শেরি!'

গুলিবদ্ধ শিশুটি
যেমন তেমনিই
পড়ে থাকল—
হিমার্ত মৃত্যুর দখলে।
জানো তুমি
সে কে?
সে
আমি।

কুয়াশার যে রাজ্যে যেতে
পাখিদেরও সাহসে কুলোয় না
আকাশের মেঘ ফুঁড়ে সেখানে উড়ে গেল
আনন্দে
নেচে নেচে
একটি ইঞ্জিন—
তোমার মনে পড়ে?

তার পাখায় চিরে চিরে গেল
হিমশীতল যবনিকা,
আর বদল হল পৃথিবীর কক্ষপথ,

গ্যাসোলিনের বাষ্প বিস্ফোরণে
প্রগতির পথ প্রশস্ত হল।
যে ইঞ্জিন মহাশূন্যে গান গায়
তা আমারই হাতের তৈরি,
আমার প্রাণের তুল্য
ইঞ্জিনের গান।
কম্পাসের কম্পিত কাঁটায়
আঠার মত লেগে ছিল
যার বিচক্ষণ দৃষ্টি,
যে লোকটা
সুমেরুবৃত্তের জমাট বরফ ভেদ ক'রে
কুয়াশা পায়ে ঠেলে
দুরন্ত সাহসে এগিয়ে গিয়েছিল
সে কে
তুমি জানো ?
সে
আমি।

আমি কাছে
আমি দূরে
আমি সব জায়গায় আছি।
আমি উদয়াস্ত খাটি টেক্সাসের কলে,
আমি মাল বই আলজেরিয়ার বন্দরে,
কিংবা গান বাঁধা কাজ আমার·
আমাকে সব জাগাতেই পাবে।

জ্রকুটিভরে তাকানো
পাজির পা-ঝাড়া,

নীচাশয়.

হে জীবন।

তুমি কি মনে করো জিতবে ?

জ্বলছি

আমি.

জ্বলছ তুমি.

আমরা দুপক্ষই

ঘেমে নেয়ে উঠেছি।

কিন্তু তুমি ফুরিয়ে ফেলছ তোমার শক্তি।

যতই দুর্বল হচ্ছ,

যতই তোমার শেষ ঘনিয়ে আসছে,

ততই তুমি হিংস্র আক্রোশে

আমাকে দিচ্ছ দংশনের জ্বালা,

হয়ত

আসন্ন মৃত্যুরই ভয়ে।...

তাহলে

তোমাকে সরিয়ে দিয়ে

সে জায়গায়

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

সকলে হাত ধরাধরি ক'রে

আমরা গড়ে তুলব

আমাদের মনের মতন

ঠিক যেমনটি দরকার

তেমনি

জীবন—

সে জীবন

কতই না সুন্দর হবে !

দিন আসবে

এই আমি—
এই নিই হাওয়ায় নিশ্বাস,
কাজ করি,
প্রাণের প্রাচুর্যে থাকি বেঁচে,
(নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে)
আমার কবিতা যাই লিখে।
জীবনের ভ্রূকুটির চোখে
চোখ রাখে কটাক্ষ আমার।
আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে
জীবনের সঙ্গে আমি যুঝি।
জীবনের সঙ্গে থাক যতই বিবাদ—
ভুলেও ভেবো না
আমি কবি জীবনকে ঘৃণা।
বরং উল্টোটা সত্য—
মরে যাই সেও ভালো
তবু চাইব
জীবনের বাঘনখ
আমাকে জড়াক বাহুডোরে!
যদি কোনোদিন
আমাকে ফাঁসির মঞ্চে তুলে
গলায় দড়ির ফাঁস পরাতে পরাতে
জল্লাদেরা বলে:

"প্রাণে যদি শখ থাকে আরও এক ঘণ্টা বাঁচতে পারো"

তক্ষুনি চিৎকার ক'রে বলে উঠব:

'খুলে দাও,
খুলে দাও শয়তান কাঁহাকা !
ছুটে এসো—
খুলে দাও দড়ি।'

জীবনের জন্যে যদি হয়—
আমাকে যে কাজ দেবে
নেব মাথা পেতে
আকাশে পরীক্ষা নেব প্রাণ হাতে ক'রে
বিমানযন্ত্রের।
খুঁজব নতুন গ্রহ যা অদৃষ্ট আজো—
মহাকাশে
ছুটে যাব
একা—
রকেটের প্রবল গর্জনে।

মুখ তুলে
চেয়ে থাকব
তখনও আকাশে—
বিস্মিত পুলকে।
জীবন তখনও দেবে
আনন্দের দোলা—
তখনও রোমাঞ্চকর হয়ে থাকবে
এ মাটিতে এই বেঁচে থাকা।

কিন্তু দেখ,
যদি তুমি হাত দাও
আমার বিশ্বাসে,
রাগে আমি অন্ধ হব

আহত বাঘের মত
আক্রোশে লাফিয়ে পড়ব ঘাড়ে।

কেননা বিশ্বাস গেলে
কিছুই থাকে না।
যদি খোয়া যায় এককণাও বিশ্বাস
থাকি না আমাতে আর আমি।

সহজ কথায় বললে
কথাটা দাঁড়ায়—
আমার বিশ্বাস গেলে খোয়া
আমিই থাকি না।
এ রাত প্রভাত হবে;
দিন আসবে,
জীবন সুখের দেখবে মুখ,
পরিণামদর্শী হবে
অভিজ্ঞ জীবন

—মন থেকে আমার বিশ্বাস
চাও তুমি মুছে দিতে ?
বুলেটে
ওড়াবে ?

কী দরকার!
বৃথাই খরচ হবে গুলি।

আমার বুকের বর্মে ঢাকা
বিশ্বাস আমার।
আমার বিশ্বাস ভাঙবে
তেমন বুলেট
ত্রিভুবনে নেই।

স্মৃতি

আমার কাজের সঙ্গীটিকে

মনে পড়ে

—কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি।

দোষ তার একটাই ছিল শুধু কাশত।

কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া—

প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে

পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।

খাড়ে ক'রে বস্তা বস্তা কয়লা বইত,

পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই।

ঝুলকালি ভেদ ক'রে

আমাদের নিরুদ্ধ পিঞ্জরে

কচিৎ কখনও যদি দেখা দিত

একফালি রোদ—

দৃষ্টি তার কী আগ্রহে মেটাত পিপাসা।

তার সে চাতক দৃষ্টি

চোখ বুঁজলে আজও দেখতে পাই।

যখন বসন্ত আসত

দূর থেকে

ভেসে আসত পাতার মর্মর।

ঝাঁকে ঝাঁকে

উড়ে যেত

আকাশে বলাকা—

কী দুরন্ত পিপাসায়
সে হত কাতর!
চোখে তার আবেদন,
দুঃসহ বেদনা—
কী যে দুর্বিষহ সে বেদনা!

বসন্ত আবার যেন ফিরে আসে
আরেকটি বসন্ত যেন দেখে যেতে পারি—
এই তার করুণ মিনতি।

একদা বসন্ত এল
রূপ যেন ফেটে পড়ছে,
সঙ্গে সূর্য।
স্নিগ্ধ হাওয়া,
ফুটন্ত গোলাপ

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ
বয়ে আনল
চাঁপার সৌরভ।
আমরা রইলাম তবু
যে তিমির সেই তিমিরেই
বুকে নিয়ে জগদ্দল পাথরের ভার।
হঠাৎ একদিন
জীবনের তাল গেল কেটে।

বয়লারে গোলমাল দেখা দিল
কী কারণে কিছুই জানি না।
প্রথমে ঘড়ঘড় শব্দ,
তারপর একেবারে চুপ।

হয়ত বা সেই ছোকরা
মরেছিল ব'লে।

অথবা আমারই ভুল।
চেয়েছিল হয়ত সে
বয়লার!
আগুনে ইন্ধন দিক
পরিচিত হাত।

হলেও তা হতে পারে
জানিনা সঠিক।

মনে হল, কোঁপাতে কোঁপাতে
অস্ফুট কাতরস্বরে বলছিল বয়লার :
'কোথায়, কোথায় গেছে বলো সে ছেলেটি!

সে ছেলেটি?
মারা গেছে।
বাইরে বাড়াও মুখ, দেখ—
বসন্ত এসেছে।
দূরে বহুদূরে
পাখিরা আকাশে উড়ছে।
আর কোনোদিন
সে ছেলেটি এ দৃশ্য দেখবে না।

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
—কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি!
দোষ তার একটাই ছিল শুধু
কাশত।

কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া—
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে ক'রে বস্তা বস্তা কয়লা বইত
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই॥

রোমান্স

আজ
যে কবিতা
রচনা করার ইচ্ছা

তাতে
ছত্রে ছত্রে
থাকে যেন
একালের সুর—

স্পর্ধায়
যেমন ক'রে
দৈত্যকায় ডানা

ঝাঁট দেয়
এ পৃথিবী
মেরু থেকে মেরু

কেন লোকে খেদ করে ?
অতীতের জরাজীর্ণ
স্বপ্নজাল নিয়ে
কেন ফেলে দীর্ঘশ্বাস এত ?

নীল মহাশূন্যে গতিমুখর ইঙ্গিতে

আজকের রোমান্স,

আগে সে-গানের বোঝা ধ্রুবপদ

আশা ছেড়ো পরে।

সেই গান আনে

ইস্পাতের স্ববশ ডানায়

দারুণ দৃঢ়তা

মানুষের প্রাণে।

অচিরকালের মধ্যে এই সব পাখি

ভূমিতে

ছড়াবে বীজ।

আকাশে বাতাসে তোলে প্রতিধ্বনি

পাখিদের গান

মানবমুক্তির নামে

জয়ধ্বনি দেয়।

পাখা মেলে হবে তারা পার

মহাসমুদ্রের নীল জল

গ্রীষ্মমণ্ডলের রাঙা মাটি

সবুজ জঙ্গম শস্য

চিরতুষারের শুভ্র দেশ।

ছোট ছোট গণ্ডী ভেঙে দিয়ে

পৃথিবীকে

আলিঙ্গনে বেঁধে

বিমানে গতির পাল্লা

জন্ম দিচ্ছে,

সস্নেহে লালন করছে, দেখ—

নতুন রোমান্স।

শেষকথা

ভেঙেছে বাঁধ হৃদয়হীনতার ঢেউ—
লোকে বলছে,
রামরাবণের যুদ্ধ।
আমি যাচ্ছি।

জায়গা নেবে আর কেউ
কে গেল কে এল—সে নাম তুচ্ছ।

এই তো সহজ নিয়ম, এই তো বাস্তব
এক বুলেটে—
কৃমিকীটের খাদ্য
ছুটে আসব আবার,
প্রিয় ভাই সব,
বজ্র যখন বাজবে ঝড়ের বাদ্য।

পাবলো নেরুদা-র
কবিতাগুচ্ছ

ভুলতে পারছি না

যদি আমাকে জিগ্যেস করো কোথায় ছিলাম
বলতে হবে 'এই রকমই হয়',
বলব পাথরে পাথরে ঢেকে-যাওয়া জমির কথা
থেকেও যে নিজেকে খুইয়ে ফেলে, সেই নদীর কথা বলব।
আমি শুধু জানি পাখিদের হারানো জিনিস,
পেছনে ফেলে-আসা সমুদ্র কিংবা আমার বোনের কান্না।
কেন আলাদা আলাদা এত অঞ্চল, কেন দিনের
পায়ে পায়ে দিন আসে ? কেন কালো রাত
মুখের মধ্যে দনায় ? মৃতের দল কেন ?

কোথা থেকে এসেছি যদি জিগ্যেস করো তাহলে ভাঙা জিনিসগুলোর
কথা আমাকে তুলতে হবে,
ভয়ানক তেতো তেতো সব হাঁড়িকুড়ি,
প্রায়শ পচা বিশাল বিশাল সব জানোয়ার,
বলতে হবে আমার ব্যথায় কাতর হৃদয়ের কথা।

পরস্পরকে কাটাকুটি করা স্মৃতি নয় সেসব
বিস্মৃতির রাজ্যে ঘুমিয়ে পড়া ছাইরঙা পায়রাও তারা নয়
চোখের জলে ভাসা সেসব মুখ,
গলায় তাদের আঙুল দেওয়া,
পাতার সঙ্গে টুপ টাপ খসে-পড়া,
একটি অতিক্রান্ত দিনের অন্ধকার,
যে দিনটিকে গিলিয়েছি আমরা আমাদের দুঃখী রক্ত।

দেখ ল্যাজঝোলা পাখি, দেখ বেগুনে ফুল
যা কিছু আমাদের অসম্ভব ভাল লাগে
লম্বা ঝুলওয়ালা কার্ডের ছাপা ছবিতে যাদের দেখতে পাও
যার ভেতর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় সময় আর মাধুর্য।

কিন্তু এই দাঁতগুলো পেরিয়ে আর যেন আমরা ভেতরে না যাই
নৈঃশব্দ্যের জমানো খোলাগুলোর গায়ে যেন দাঁত না বসাই,
কেননা আমি কী উত্তর দেব আমি জানি না

কত যে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই,
লাল রোদ্দুরে ছিন্নভিন্ন হয়েছে কত যে বাঁধ,
জাহাজের গায়ে ঠুকে গেছে কত যে মাথা,
চুম্বনের সময় গণ্ডি দিয়ে ঘিরেছে কত যে হাত,
এমনি আরও কত কিছু আমি ভুলতে চাই।

মিতালি

মাটিতে পড়ে-যাওয়া ধুলোমাখা চাহনিগুলো থেকে
কিংবা নিঃসাড়ে নিজেদের কবর দেওয়া পাতাগুলো থেকে।
আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত দিনের অভাব নিয়ে, শূন্যতা নিয়ে
নিরালোক ধাতুগুলো থেকে।
হাতগুলোর শীর্ষে প্রজাপতিদের ঝিকমিক,
অপার দ্যুতিময় প্রজাপতিদের শূন্যে ঝাঁপ।

পরিত্যক্ত সূর্য যাদের গোধূলিতে গির্জাগুলোতে ছুঁড়ে দেয়
সেই ভাঙাচোরা প্রাণীদের পদচিহ্নের, আলোর পথরেখার
তুমি ছিলে প্রহরী।
চাহনিগুলোর ঈষৎ আভা নিয়ে, মৌমাছিদের সারবস্তু নিয়ে
তোমার অপ্রত্যাশিত প্রস্থানের ঝলক জাগানো উপাদান
সোনার সংসার সমেত দিনটির আগে যায় আর পরে আসে।

চোখ এড়িয়ে দিনগুলো থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে
তবে তোমার আলোর কণ্ঠস্বরে এসে যায়

হে প্রেমের নাগরী, তোমার প্রাণ-জুড়ানো কোলে
আমি স্থাপন করেছিলাম আমার স্বপ্ন, আমার কিছুতে কিছু
না বলার স্বভাব।

স্নানাভাবগ্রস্ত দিনগুলোর কোঁদলের পর
আর মন্থর মৃত্যু আর ফুরানো উদ্দীপনায় ঠাণ্ডা-হওয়া
তোমার ক্ষীণাঙ্গ শরীর যখন
মাটির সীমানির্ধারক রাশির দিকে হঠাৎ নিজেকে ছড়াল,
আমি অনুভব করতে পারছি
তোমার বুকের দহন আর তোমার চুম্বনের সঞ্চরণ :
আমার স্বপ্নে কেবলি নতুন করে গিলছে।

কখনও কখনও তোমার অশ্রুর ভাগ্য উঁচুতে চড়ে
যেমন বয়স চড়াও হয় আমার কপালে, যেখানে
ঢেউগুলো আছড়াচ্ছে, মৃত্যুর অভিমুখে নিজেদের ভাঙছে
তাদের আন্দোলন আর্দ্র, হতাশায় ম্রিয়মাণ, চূড়ান্তভাবে শেষ॥

স্বপ্নের পক্ষিরাজ

নিরর্থক, আর্শিতে নিজেকে নিজে দেখা,
সপ্তাহের আর ছবির আর কাগজের আহ্লাদ নিয়ে,
আমি আমার হৃৎপিণ্ড থেকে নরকের পালের গোদাকে
টান মেরে ফেলে দিই,
বাক্যের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে বিষণ্ণ বাক্যগুলোকে আমি সাজাই।

এখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়াই, মোহগুলো নিজের করি,
কথা বলি বাবুইদের সঙ্গে তাদের বাসায় গিয়ে :
তারা, প্রায়ই, নিরুত্তাপ আর সর্বনাশের গলায়
গান গায় আর মোহগুলো চটিয়ে দেয়।

আকাশে ছড়িয়ে আছে এক বিস্তৃত দেশ
রামধনুর ভস্মস্তূপের কাঁথা
আর রাত নিশুতির গাছপালা নিয়ে :
সেখানে আমি যাই, ক্লান্তি একটু থাকে না তা নয়,
এক রকম সদ্য কবর-দেওয়া ওল্টানো মাটিতে পা ফেলে ফেলে
গিয়ে আমি সেই আচাভুয়ো উদ্ভিদকুলের গাছপালার মধ্যে স্বপ্ন দেখি।

যেন আমি মৌলিক জিনিস এবং নিরানন্দ সত্তা
এমনিভাবে সেজে ব্যবহৃত দলিলপত্রের মধ্যে, উৎপত্তির মধ্যে হাঁটি ;
আমি ভালবাসি ভক্তিশ্রদ্ধার নিঃশেষিত মধু,
সেই সুমিষ্ট কথামৃত যার পাতায় পাতায়
ঘুম যায় বুড়ো-হয়ে-যাওয়া রং-ওঠা বেগুনে ফুল,
আর কাঁটাগুলো, সাহায্যের সঞ্চালক,
তাদের চেহারায়, সন্দেহ নেই, আছে দুঃখ আর নিশ্চয়তা,
আমি তছনছ করি শিটি-মারা গোলাপ আর ভাবে বিভোর ব্যাকুলতা ;
আমি ছিন্নভিন্ন করি দুদিকেরই আদর-পাওয়া চরম : আর তার ওপর
আমি আছি ব্যতিক্রমহীন, অপরিমেয় সময়ের অপেক্ষায় :
আমার আমি-র মধ্যেকার এই আহ্লাদ আমাকে ম্রিয়মাণ করে।

এসে হাজির হয়েছে কী একটা দিন ! কী নিবিড় দুগ্ধধবল আলো,
ঠাসবোনা, অখণ্ড, কার মুখ দেখে উঠেছি আজ !
আমি শুনেছি তার রাঙা ঘোড়ার হ্রেষা,
নিরাবরণ, নালবিহীন আর ভাস্বর।

তাকে নিয়ে আমি গির্জার মাথার ওপর উড়ে যাই
সৈন্যদের পরিত্যক্ত ব্যারাকের পাশ দিয়ে টগবগিয়ে চলে যাই,
আর এক অশুচি পল্টন আবার পিছু নেয়।
তার ইউক্যালিপ্টাস চোখ লুট ক'রে নেয় ছায়া,
তার ঘণ্টাতুল্য দেহ টগবগিয়ে চলে যায় আর সপাং সপাং ক'রে মারে।

আমার চাই অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বলতার একটা বিদ্যুতের ডোরা,
আমার দায়ভাগ নেবার জন্যে ইষ্টিকুটুম্বের একটি উৎসব ॥

একত্ব

কাছাকাছি ঘেঁষে, ঐক্যভাবে, স্থিতধী হয়ে অন্তর্দেশে কিছু নিহিত আছে,
যে কেবলি তার সংখ্যার, তার পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নের
পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছে।
তাকে পাথরেরা দেখায় সময়ের হাতের স্পর্শ,
তাদের সূক্ষ্ম শরীরে বয়সের কেমন একটা গন্ধ,
লবণাক্ত আর স্বপ্নময় সমুদ্রবাহিত জলে।

আমাকে ঘিরে এক এবং অভিন্ন বস্তু, মাত্র একটিই গতি,
খনিজের ভার, গাত্রচর্মের চেকনাই,
রাত্রি কথাটির ধ্বনিটিকে ধ'রে রয়েছ :
মসি গোধূমের, হাতির দাঁতের, চোখের জলের
জিনিস চামড়ার, কাঠের, পশমের
বয়স হয়ে যাওয়া, অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া, সব এক রকম,
দেয়ালের মত আমার চার পাশে একাকার হয়ে যায়।

আমি সেই আমারই টুঁটি টিপে ধ'রে কাজ করি,
আমি সেই আমারই চারদিকে পাক খাই,
মৃত্যুকে বেড় দেয় যেন একটা দাঁড়কাক, বিয়োগবিধুর এক দাঁড়কাক।
আমি নিগূঢ় হয়ে ভাবতে থাকি, ঋতুচক্রের বিস্তারের মধ্যে আমি বিচ্ছিন্ন,
নিঃশব্দ ভূগোলে পরিবৃত আমি রয়েছি নাভিতে :
আকাশ থেকে খসে পড়ে তাপমাত্রার একটি খণ্ড,
বিহ্বল একত্বগুলোর এক চূড়ান্ত রকমের সাম্রাজ্য
গড়ে উঠছে সর্বতোভাবে আমাকে ঘিরে ॥

রুচি

ভুয়ো জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্যে কতকটা মড়াকান্না-জোড়া লোকাচারের জন্যে
যার গায়ে থাকে অবিনশ্বরতার পোশাক, এবং যার অনুষ্ঠান
রাস্তার ধারে না হয়ে যায় না,
আমি মনে মনে একটা টান পড়িয়ে রেখেছি, তাতেই আমার
একমাত্র রুচি।

ফেলে-দেওয়া আসবাবের মতন জীর্ণ বাক্যালাপের ওপর আমার টান,
যে আছে চেয়ারের নতজানু ভাব নিয়ে, যার মুখের কথাগুলো
গৌণ ইচ্ছার গোলাম হয়ে খিদ্‌মত করতে ব্যস্ত,
যার ভেতর রয়েছে ছুধের, অতিক্রান্ত সপ্তাহের,
নগরশীর্ষে শৃঙ্খলিত বায়ুমণ্ডলের বশ্যতা।

কে পারে আর এর চেয়ে শরীরী তিতিক্ষার বড়াই করতে ?
বিচক্ষণতা আমাকে জড়িয়ে রাখে
সাপের মত রং-ফেরানো একটা আঁটসাঁট চামড়ায় :
হায়, মাত্র এক চুমুক মদেই আমি এই-দিনটিকে বিদায় ক'রে দিতে পারি
এক রকমের এই পৃথিবীর অনেক দিন থেকে যে দিনটিকে
আমি বরণ করে নিয়েছিলাম।

সামান্য রক্তের সারাংসারে ভরপুর হয়ে আমি বেঁচে থাকি, চুপচাপ
বুড়ি মা-র মত, এক দৃঢ়বদ্ধ তিতিক্ষা
গির্জার ছায়ার মত কিংবা হাড়গুলোর জুড়িয়ে যাওয়ার মত।
এই জলরাশির সুগভীর দাক্ষিণ্যে আমি ভ'রে উঠি।
এইভাবে আপাদমস্তক সজ্জিত হয়ে, বিষণ্ণ নিবিষ্টতার মধ্যে আমি
ঘুমিয়ে পড়ছি।

আমার গীটারসদৃশ অন্তর্দেশে একটা প্রাচীন সুর আছে,
যা নিরস আর ভরাট যা নিত্য, যা নিশ্চল,

যেন এক বিধ্বস্ত প্রাণরস, ধোঁয়ার মত ;
এক নিবৃত্ত মৌল, এক জিয়ন্ত তেল :
এক আচারনিষ্ঠ পাখি আমার চুলের যত্ন নেয় :
এক অপরিবর্তনীয় দেবদূত বাস করে আমার তরবারির মধ্যে ॥

কাব্যকৃতি

এদিকে ছায়া ওদিকে বিস্তার, এদিকে গড়রক্ষী ফৌজ
ওদিকে কুমারী মেয়ের দল,
মাঝখানে সৃষ্টিছাড়া হৃদয় আর সর্বনাশা স্বপ্ন বুকে নিয়ে,
গেল-গেল রবে পাংশু, বিনষ্ট কপাল,
আর জীবনের প্রত্যেকটি দিনের জন্যে একজন কুপিত
মৃতদার পুরুষের হা-হুতাশ নিয়ে,
হায় আমার ঘুমচোখে পান-করা চক্ষুর অগোচর প্রতি ফোঁটা জলে,
আর কানে-আসা সমস্ত শব্দে, কাঁপতে কাঁপতে,
আমার সেই একই বিমনা তৃষ্ণা আর সেই একই ঠাণ্ডা জ্বর,
সদ্যোজাত এক শ্রুতি, এক কুটিল যন্ত্রণা,
যেন এখুনি এসে পড়বে হয় চোরের দল নয় ভূতের পাল,
এবং মোক্ষম আর গভীর পরিসরের একটা খোলার মধ্যে,
এক অবমানিত পরিচারকের মত, একটু ফেঁসফেঁসে ঘণ্টাধ্বনির মত,
যেন এক লক্কড় আয়না, যেন একটা পরিত্যক্ত বাড়ির গন্ধ
যে বাড়িতে ভাড়াটেরা রাতের বেলায় ঢোকে একেবারে বেহেড হয়ে,
আর মেজের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাসি কাপড়ের গন্ধ, আর
ফুলের কোনো পাট না থাকা।
নাকি অন্যভাবে, এর চেয়ে কম বিমর্ষভাবে, হয়ত বলা যায়—
কিন্তু, আদতে দাঁড়াল, অকস্মাৎ, আমার পাঁজরে ঘা-মারা হাওয়া,
আমার শোবার ঘরে একে একে এসে পড়া অশেষ মোটা রকমের রাত্রি,

বলিদান নিয়ে জলন্ত যে দিন তার হৈ চৈ,
আমার মধ্যে যতটুকু কবিদৃষ্টি আছে তারা চাইছে, ম্লান মুখে,
আর নানা বস্তুর একটা ঠোকাঠুকি চলেছে কিন্তু তাদের ডাকে
কোনো সাড়া মিলছে না,
এক ক্লান্তিহীন আন্দোলন, আর নাম নিয়ে এক বিভ্রাট॥

আবার শরৎ

ঘন্টাগুলো থেকে লুটিয়ে পড়ে একটা শোকগ্রস্ত দিন,
যেন কোনো অস্পষ্ট বিধবার বেপথু পোশাক,
একটা রং, মাটিতে মুখ গোঁজা
চেরীর স্বপ্ন,
জল আর চুম্বনের রং পালটে দিতে
বিরামহীনভাবে ফিরে আসা ধোঁয়ার রেখা।

আমি ঠিক বোঝাতে পারছি কিনা জানি না . মাথার ওপর থেকে
রাত্রি যখন নামায়, যখন একা কবি
জানলায় শুনতে পায় শরতের ধাবমান অশ্বদলের খুরধ্বনি
আর পদদলিত ভয়ের পাতার মর্মর তাদের ধমনীতে,
আকাশে কী যেন কী, ষাঁড়ের আকাঠ জিভের মত,
কী যেন কী আকাশ আর আবহের সংশয়ে।

যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরে যায়,
যে না হলে চলে না সেই উকিল, কাজ করার হাতগুলো,
গাড়ির তেল, মদের বোতল,
বেঁচে থাকার সমস্ত চিহ্ন, সর্বোপরি বিছানাগুলো
রক্তাক্ত তরলে ভরে আছে, নোংরা কানগুলোতে লোকে
ঢেলে দিচ্ছে তাদের গোপন কথা,

আততায়ীরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে।
তবু ঠিক এ নয়, পুরনো সেই টগবগিয়ে চলা
কম্পমান তবু চিরায়ত সেই থুথ্‌রে শরতের ঘোড়া।

পুরনো শরতের আছে লাল দাড়ি
আর তার দুগাল ঢেকে আছে বিভীষিকার ফেনায়
আর তার পিছু নেওয়া হাওয়ার গড়নটা সমুদ্রের
আর তার গায়ে গোর দেওয়া পচনের খোশবু।
আকাশ থেকে রোজ নেমে আসে এক পাঁশুটে রং,
পায়রাদের ছড়াতে হয় তা জমির এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো :
চোখের জলে আর ভুলে যাওয়ায় পাকানো হয় যে দড়ি,
ঘণ্টাগর্ভে বছরের পর বছর সুপ্ত ছিল যে সময়,
সব কিছু,
পোকায়-খাওয়া জীর্ণ কাপড়, তুষার আসতে দেখা রমণীর দল,
না ম'রে যা কেউ ধারণায় আনতে পারে না সেই কালো আফিমের
ফুল,—
সব কিছু আমার উদ্যত হাতে এসে পড়ে
বর্ষণের মধ্যে॥

কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি

তোমরা জানতে চাইবে : তো কোথায় সেই নীলগাছের ফুল ?
আর অফিম ফুলে আবৃত নিগূঢ় তত্ত্ব ?
আর অনেক সময় কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করা সেই বৃষ্টি
যে তার কথাগুলো কোটরে কোটরে আর পাখিতে পাখিতে
ভরিয়ে রাখত ?

আমার যে কী হয়, দাঁড়াও, আমি তোমাদের বলছি।

আমি থাকতাম
মাদ্রিদের এক উপকণ্ঠে, যেখানে ঘণ্টা ছিল,
ঘড়ি ছিল, গাছ ছিল।

সেখান থেকে দেখা যেত
কাস্তিলার শুকনো মুখ
চামড়ার সমুদ্রের মত।

আমার বাড়িটাকে বলা হ'ত
ফুলবাড়ি, সব জায়গায় বকফুল
ফুটে থাকত ব'লে : বাড়িটা
বড় সুন্দর,
বাড়িময় কুকুর আর বাচ্চাকাচ্চা।

রাউল, তোর মনে পড়ে ?
তোর মনে পড়ে, রাফায়েল ?
ফেদেরিকো, তোর মনে পড়ে
মাটির তলা থেকে,
মনে পড়ে আমার বাড়িময় সেইসব অলিন্দ
যেখানে জুন মাসের আলোয় তোর হাসুখের ফুলগুলো ডুবে যেত ?

ভাই, ও ভাই !

সব
দরাজ গলা, বেচাকেনার রসকষ,
বুকের মধ্যে হাঁচড়-পাঁচড়-করা রুটির তালগোল,
আমার আরগুয়েলের সেই শহরতলির হাটে
মাছপট্টির মাঝখানে দোয়াতের মত পাথরের মূর্তি
তেল পৌঁছুত পলায়,
হাত আর পায়ের
বিস্তর হট্টগোলে ভ'রে উঠত রাস্তা,

এইটুকু মাপে, এইটুকু ওজনে অসম্ভব তাৎপর্য পেত
জীবন,
গাদা করা যাচ্ছ,
নিস্তাপ সূর্য নিয়ে, ছাদগুলোর যে বুনট, তার মধ্যে
বাপমুখ ক্লান্তি ধরায়।
আলুর আত্মহারা চিকন গজদন্ত আভা,
আসমুদ্র টমেটোর পুনরাবৃত্তি।

একদিন সকালে কী হল, হঠাৎ সব কিছু দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল :
একদিন সকালে
টপাপট জীবন গিলতে গিলতে
মাটি থেকে বেরিয়ে এল দাবানল,
আর তখন থেকে আগুন,
গুলিবারুদ সেই তখন থেকে,
আর তখন থেকে রক্ত।

উড়োজাহাজ আর মুরের নিয়ে ডাকাতের দল,
আংটি আর বেগমসাহেবাদের নিয়ে ডাকাতের দল,
আশীর্বাদকের ভূমিকায় কালো কাপড়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে
ডাকাতের দল
আকাশ থেকে পড়ল শিশুদের খুন করার জন্যে
আর রাস্তায় রাস্তায় শিশুদের রক্ত
বয়ে গেল সরলভাবে, অবিকল শিশুদের রক্তের মত।

শেয়ালগুলো, যাদের দেখে একটা শেয়ালও ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নেবে,
নিরেটগুলো, যাদের শুঁটকো কন্টিকারিও মুখ থেকে থু ক'রে ফেলে দেবে,
কেউটেগুলো, যাদের দেখে কেউটেরাও নাক সিঁটকোবে!

তোমাদের সামনাসামনি আমি উঠে আসতে দেখেছি
স্পেনের রক্ত

গর্বের আর ছুরির একটি একক ঢেউয়ে
তোমাদের তলিয়ে দিতে।
জেনারেলের দল
বেইমানের দল :
দেখ আমার মৃত বাড়ি,
দেখ স্পেন ভেঙে মিস্‌মার :
তবু প্রত্যেকটা মৃত বাড়ি থেকে বেয়ে আসছে জলন্ত ধাতু
ফুলের বদলে,

স্পেনের প্রত্যেকটি কোটর থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্পেন,
প্রত্যেকটি নিহত শিশুর কাছ থেকে এসে, যাচ্ছে চোখ-কোটোনো
একটি ক'রে বন্দুক

প্রত্যেকটি পাপ থেকে জন্মাচ্ছে বুলেট
যা একদিন ঠাই খুঁজে নেবে
হৃৎপিণ্ডে।

তুমি কি জানতে কেন তার কোনো কবিতায়
ঘুণাক্ষরেও থাকে না
যেখানে সে দেখেছে সেই দেশের মৃত্তিকা আর পাতার কথা,
বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরির কথা ?

এসো দেখ রক্ত রাস্তাময়,
এসো দেখ
রক্ত রাস্তাময়।
এসো দেখ রক্ত
রাস্তাময়।

মাদ্রিদে পদার্পণ করল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড

সকালটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা,
শীতের সেই মাসটা ছিল ভারি কষ্টের, কাদায় আর ধোঁয়ায় মলিন,
ছাদ না থাকা একটি মাস, অবরোধ আর দুর্ভাগ্যে বিষণ্ণ একটি মাস,
যখন আমার বাড়ির ভিজে শার্সিগুলো পেরিয়ে ভেসে আসছিল
শুনছিলাম
রাইফেলের মুখে আফ্রিকায় শেয়ালদের হাঁকডাক আর রক্তে
চপচপ করা তাদের দাঁত,
তখন,
যখন আশা বলতে আমাদের শুধু বারুদের স্বপ্ন, যখন আমরা মনে
করছিলাম
শুধু গিলে-খাওয়া রাক্ষসে আর মার-উচাটনে পৃথিবীটা ভর্তি।
তখন, মাদ্রিদের শীতের মাসের বরফ ভেদ করে, ভোরবেলার
কুয়াশায়
আমি দেখলাম আমার এই চোখদুটো দিয়ে, আমার এই চক্ষুষ্মান
হৃদয়টা দিয়ে,
আমি দেখলাম এসে পৌঁছল নিষ্ঠাবানের দল, স্বল্পসংখ্যক আর দৃঢ়বদ্ধ
পরিণত আর মহাউৎসাহী প্রস্তরকঠিন বাহিনীর বিরাট পুরুষ
সৈনিকেরা।

সে ছিল এক শোচনীয় সময় যখন মেয়েদের
এক ভয়ঙ্কর গনগনে কয়লার মত বহন করতে হত অদর্শন
আর হিস্পানী মৃত্যু, অন্যান্য মৃত্যুর চেয়ে ঢের বেশি কটু আর তীক্ষ্ণধার,
সেইসব জমির ওপর ঝুলে থাকত—
এই সেদিনও যে সব জমিকে গৌরবান্বিত করেছে গোধূম।

রাস্তা দিয়ে মানুষের চূর্ণিত রক্ত গিয়ে মিশেছিল
ঘরবাড়ির ভেঙে-পড়া হৃদয় ফেটে বেরিয়ে আসা দরবিগলিত জলধারায়;
ছিন্নভিন্ন শিশুদের হাড়, জননীদের শোকবিলাপের মর্মন্তুদ নৈঃশব্দ্য,

অরক্ষিতদের চোখ চিরদিনের মত বন্ধ
এ সমস্তই যেন মন ভার হওয়া আর হারানো, যেন পুড়ে-ফেলা বাগান,
এ সমস্তই চিরদিনের মত নিহত বিশ্বাস আর নিহত ফুল।

কমরেডরা আমার,
তখন,
তোমাদের আমি দেখেছিলাম।
আর আমার চোখ জুড়ে এখনও গর্ব
কেননা কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল পেরিয়ে কাস্তিলার শুচিশুভ্র ললাটের দিকে
আমি তোমাদের আসতে দেখেছিলাম,
নীরব আর কঠিন,
ভোরের আগে ঘণ্টাধ্বনির মত,
অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না আর নীল নীল চোখ নিয়ে সেই কোন দূর
দূর থেকে আসা,
তোমাদের প্রান্তগুলো থেকে, তোমাদের হারানো হৃত দেশগুলো থেকে
তোমাদের স্বপ্নগুচ্ছ থেকে,
পোড়া মধুরতা আর বন্দুকে কানায় কানায় হয়ে
স্পেনের শহর রক্ষা করতে
যেখানে জানোয়ারদের দংশনে
কোণঠাসা স্বাধীনতার পতন আর মৃত্যু হতে পারে।

ভাইরা আমার, এখন থেকে
তোমাদের শুদ্ধতা আর শক্তি, তোমাদের বিধিসম্মত ইতিহাস,
শিশু আর পুরুষ, স্ত্রীলোক আর বুড়োমানুষের কাছে জ্ঞাত হোক,
যারা আশাহারা তাদের সকলের কাছে পৌঁছোক, গন্ধকের বায়ুতে
ক্ষয়ে-যাওয়া খনিগর্ভে নামুক,
ক্রীতদাসের অমানুষিক সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাক,
যেন সমস্ত নক্ষত্র, যেন কাস্তিলার আর দুনিয়ার সমস্ত ধানের শীষ
লিপিবদ্ধ করে

তোমাদের নাম আর তোমাদের দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়া সংগ্রাম
আর লাল দেবদারুর মত শক্তিমান আর মৃন্ময় তোমাদের বিজয়।

যেহেতু তোমাদের আত্মোৎসর্গ দিয়ে তোমরা সম্ভব করেছ
উজ্জীবিত করতে
হৃত বিশ্বাস, চলে যাওয়া আনন্দক্ষণ, পৃথিবীতে আশা ভরসা
আর তোমাদের অপর্যাপ্ততার ভেতর দিয়ে, তোমাদের মহনীয়তার
ভেতর দিয়ে,
তোমাদের মৃতদেহের ভেতর দিয়ে
যেন রক্তের প্রস্তরকঠিন কোনো উপত্যকার মাঝখান দিয়ে
বসন্তের আর আশার বনকপোত নিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক মহাকায় নদী॥

ব্রুসেল্‌স্

আমার করে ফেলা সব কাজ, আমার হারিয়ে ফেলা সব জিনিস,
থেকে থেকে আমার জড় করা সব কিছু,
ভিক্ষু লোহায়, বিদায়কালে হাত বাড়িয়ে তা থেকে আমি সামান্যই
নিয়ে যেতে পারি।

হঠাৎ আঁতকে ওঠার একটা স্বাদ,
জলন্ত সব চিলের পালকে ঢেকে যাওয়া একটা নদী,
পাপড়িতে পাপড়িতে গন্ধকে উস্কানো একটা পিছুটান।

আমাকে এখনও মার্জনা করে নি অখণ্ড লবণ
করে নি অবিচ্ছিন্ন রুটি, করে নি সমুদ্রের বৃষ্টিতে ধোয়া
ছোট্ট গির্জা, আমাকে এখনও মার্জনা করে নি
গুপ্ত কোনায় দগ্ধ কয়লা।

আমি তল্লাস ক'রে তারপর পেয়েছি, অপবাপ্ত,
মাটির তলদেশে, তরঙ্গ দেহগুলোর মাঝখানে,
কঠিন অভ্রের নিচে আসা-যাওয়া করা
পাণ্ডাশ কাঠের একটা দাঁতের মত,
যন্ত্রণার মালমশলার কাছে,
এদিকে চাঁদ আর ওদিকে ছুরিছোরা
এই দুইয়ের মধ্যে নিশিকালে মরে যাওয়া।

এখন এই
হিসেব-না-করা বেগের মাঝখানে, তারবিহীন
দেয়ালের পাশে,
সীমাসরহদ্দ দিয়ে ঘেরা রসাতলে
যে নক্ষত্রপুঞ্জ খোয়ায় তার সঙ্গে
এই যে আমি এইখানে, উদ্ভিদ্‌ভাবে,
একা॥

স্তোত্র আর প্রত্যাবর্তন

হে পিতৃভূমি, হে স্বদেশ! তোমার দিকে উড়িয়ে দিই আমার রক্ত।
আমি তোমার জন্যে হতুশে, দুচোখ জলে ভ'রে
ছেলে যেমন মার জন্যে হয়।
তুমি গ্রহণ করো এই দৃষ্টিহীন বীণা
আর এই নিরুদ্দেশ ললাট।

আমি বেরিয়েছিলাম বাহিরদুনিয়ায় তোমার কোল-আলো-করা
মাণিক আনতে,
আমি বেরিয়েছিলাম তোমার নামের তুষার বুলিয়ে
মাটিতে-প'ড়ে-যাওয়াদের শুশ্রূষা করতে,

আমি বেরিয়েছিলাম তোমার চেরাই-করা শুষ্ক কাঠে
একটা ইমারত তুলতে,
আমি বেরিয়েছিলাম আহত সৈনিকদের বুকে তোমার বীরচক্র
পরাতে।

এখন আমি তোমার সারাৎসারে ঘুমিয়ে পড়তে চাই।
আমাকে দাও তোমার সেই মর্মভেদী দড়িদড়ার টলটলে রাত্রি,
তোমার জলজাহাজের রাত্রি, তোমার নক্ষত্রখচিত আকাশছোঁয়া মহিমা।

হে আমার পিতৃভূমি, আমি বদল করতে চাই আমার ছায়া।
হে স্বদেশ, আমি বদলাতে চাই আমার গোলাপ।
আমি তোমার চিকন কটিতট আমার বাহু দিয়ে ঘিরতে চাই,
আমি বসতে চাই তোমার সমুদ্রচর্ণিত পাহাড়ে,
যাতে আমি গোধূম করতলে রেখে তার অন্তর নিরীক্ষণ করতে পারি।
আমি তুলে-বেছে আনতে চলেছি সোরাগর্ত কুলতন্তু গাছগাছালি,
আমি কাটতে চলেছি ঘণ্টাধ্বনির হিমানী আঁশের সুতো,
আর তোমার স্বনামধন্য আর নিরিবিলি ফেনপুঞ্জ দেখতে দেখতে
তোমার রূপলাবণ্যের জন্যে আমি গড়ে দেব বেলাভূমির এক পুষ্পহার।

হে পিতৃভূমি, হে স্বদেশ
তোমাকে সম্পূর্ণ ঘিরে প্রতিরোধী জল
আর প্রতিরোধী তুষার,
তোমাতে মিলেছে চিল আর গন্ধক
আর তোমার নকুল আর নীলকান্তমণির কুমেরুবদ্ধ করতলে
এক ফোঁটা বিশুদ্ধ মানবিক আলো
শত্রুদের আকাশ টাটিয়ে দিয়ে ভাস্বর।

এই জন্মান্ধ, ভয়ঙ্কর আবহে
তোমার আশার কঠিন ধানছড়াগুলো উঁচুতে তুলে ধরো,
হে স্বদেশ, পাহারায় থাকো তোমার আলোর।

তোমার দূর বিস্তারে পড়েছে এইসব ভুরুর আলো,
ময়ূরের এই ভবিতব্য,
যে পথে তুমি রক্ষা ক'রে চলেছ একটিমাত্র রহস্যময় ফুল,
নিষ্প্রভ আমেরিকার বিশালতায়।

যারা আবিষ্কার করেছিল

উত্তর থেকে আলমাগ্রো এনেছিল কোঁচকানো বিদ্যুৎ,
সারা ভূখণ্ড যেন বিছানো কোনো নক্সা
নিশুত রাতে আর গোধূলিতে এমনি ক'রে দিনরাত হুমড়ি খেয়ে
সে পড়ে থাকত।
মলিন চোট-খাওয়া রণকৌশল দেখতে দেখতে
সেই হিস্পানী তার শুষ্ক মূর্তিকে মিলিয়ে দিত
কাঁটাবনের ছায়া, শিরিস আর কন্টিকারির ছায়ায়।
বরফ, তুষার আর বালুকা দিয়ে মূর্তি
আমার তন্বী স্বদেশ,
এর দীর্ঘ রেখায় শুধু নৈঃশব্দ্য,
এর সামুদ্রিক কিনারা থেকে উঠে-আসা শুধু ফেনা,
রহস্যময় চুম্বনে একে ভ'রে দেয় শুধু কয়লা।
জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরোর মত এর আঙুলে ফোস্কা পড়ায় সোনা
আর রুপো এর ভারী গৃহসদৃশ কঠিনীকৃত ছায়াকে করে
সবুজ চাঁদের মত আলোকিত।
তেলের কাছে, মদিরার কাছে, পুরনো আকাশের কাছে একদিন
গোলাপের কাছে ব'সে সেই হিস্পানী
সামুদ্রিক চিলের পুরীষ থেকে জাগা ক্রুদ্ধ পাথরের এই স্থলটি
ধারণায় আনতে পারে নি।

অকর্ষিত অঞ্চল

পরিত্যক্ত শেষ প্রান্ত।   যেখানে এলোমেলো রেখায়
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আর প্রচণ্ড কাঁটাগাছে
থরে বিথরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নীলিমা।
তাম্র শলাকায় বিদ্ধ
পাথর, বাস্তব নৈঃশব্দ্যের
সড়ক, শিলাগর্ভের লবণে নিমজ্জিত
তরুশাখা।
এই যে, এইখানে আমি,
পানপাত্র বা কটিতটের মত ধ'রে রাখা কোনো সময়ের
পাণ্ডুর পদক্ষেপে অর্পিত এক মানুষের মুখ,
ভূমণ্ডের নিষ্ক্রমণহীন প্রায়শ্চিত্তের জল,
ঝ'রে-পড়া শরীরী ফুলের গাছ,
অসামান্যভাবে রুদ্ধবাক্ আর ধৃষ্ট ধমনী।
হে আমার দেশ, বালুকাজাত ডাঁশমশার মত
তুমি পৃথিবীবাসী এবং অন্ধ, সব তোমাকে নিবেদিত
আমার অন্তরাত্মার ভিত্তিমূল, তোমার জন্যে নিত্যকাল
আমার রক্তের চোখের পলক, ফিরে গিয়ে তোমাকে দেব
আমার একসাজি পপিফুল।
তোমার খটখটে পাথরের শব্দ,
পর্বতমালার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাটা বার্ধক্য, তোমার কাঁটার
নিঃশব্দ বিপুলতা।
রাত্রি হলে আমাকে দিও,
ভূলোকের বৃক্ষলতার মাঝখানে
তোমার পতাকা আন্দোলিত করা শিশিরের সলজ্জ গোলাপ,
আমাকে দাও তোমার চাঁদ অথবা তোমার ঘোর অন্ধকারময় রক্ত
ছিটানো মৃন্ময় রুটি :
তোমার বালুতটের আলোর নিচে
কেউ মৃত নেই, শুধু আছে লবণের লম্বা লম্বা কালচক্র,
রহস্যময় জীয়ন্ত ধাতুর নীল নীল শাখা॥

মাপোচো নদীকে শীতের বন্দনা

ও হ্যাঁ অসংক্ষিপ্ত তুষার
ও হ্যাঁ তুষারের সম্পূর্ণ কোটা ফুলে কম্পমান,
ছোট ছোট সুমেরুর চক্ষুপল্লব, হিমজমাট অশনি,
কে, কে তোমাকে ডেকেছে ছাইরঙা উপত্যকায়,
কে, কে তোমাকে চিলের চঞ্চু থেকে ছাড়িয়ে টানতে টানতে এনেছে
নিচে যেখানে তোমার স্বচ্ছ জল
আমার জন্মভূমির জঘন্য চীরবাস স্পর্শ করছে ?
নদী তুমি কেন বয়ে নিয়ে চলেছ
শীতল আর গূঢ় জল,
কঠিন পাথরে প্রত্যূষ
নিচে আমার স্থানীয় শহরের থেঁতলানো পায়ের তলায়
বড় গির্জার মধ্যে যে জলকে অনায়ত্ত ক'রে রাখে ?
ফিরে যাও, ফিরে যাও তোমার তুষারের মোহানায়,
দগ্ধে দগ্ধে মরা হে নদী
ফিরে যাও, ফিরে যাও তোমার বিস্তীর্ণ হিমানীর পেয়ালায়,
তোমার নিগূঢ় উৎসে নিমজ্জিত করো তোমার রুপালী শিকড়
অথবা অশ্রুবিরহিত অন্য কোনো সাগরে তুমি নিজেকে ভাঙো।
মাপোচো নদী যখন রাত আসে
মাটিতে পড়ে যাওয়া কোনো কালো পাষাণমূর্তির মত সেই রাত
যেন দুই বিশাল চিলের মত শীত আর ক্ষুধা এ দুইয়ে কাতর
গুচ্ছের কালো কালো মাথা নিয়ে যখন ব্রিজের নিচে ঘুমোয়, ও নদী
তুষারসমুখ কঠিনহৃদয় ও নদী
কেন তুমি আবির্ভূত হও না বিশাল ব্রহ্মদৈত্যের মত
অথবা বিস্মৃতদের জন্যে তারকাসজ্জিত নতুন ক্রুশচিহ্নের মত ?
কিন্তু না, তোমার রূঢ় ছাইগুলো বয়ে যায়
লোহার পত্রাবলীর নিচে কঠিন হাওয়ায় কেঁপে ওঠা ছেঁড়া আস্তিনের
পাশ দিয়ে,

ঝাপোচো নদী তুমি কোথায় বয়ে নিয়ে যাও
নিত্য অথম-হওয়া তুষারের ডানা
উকুনদষ্ট হয়ে বরাবর তোমার বিবর্ণ উপকূলে জন্মাবে বন্ধ ফুল
আর তোমার শীতের জিভ চেঁছে দিচ্ছে আমার লুণ্ঠিত দেশের গাল ?
ব্যগ্রতা করছি, দেখো
দেখো যেন, দেখো যেন তোমার কালো ফেনার একটি বিন্দু
পলি মেখে উঠে আগুনের ফুলের দিকে যায়
আর মানুষের বীজ যেন ত্বরান্বিত করে ॥

আমি দক্ষিণে ফিরতে চাই

ভেরাক্রুজে আমি অসুস্থ, স্মরণ করছি
দক্ষিণে আমার জন্মস্থানের একটি দিন।
আকাশের জলে খলবল করা মাছের মত রুপালী একটি দিন।
ঊর্ধ্বলোক থেকে পাঠানো লীকোশ, লীকিমাই, কারাভেয়ে
নৈঃশব্দ্যে আর শিকড়ে পরিবৃত,
চামড়া আর কাঠের তৈরি তাদের সিংহাসনে আসীন।
দক্ষিণ হল মন্দগতি গাছ আর শিশিরকণার
বরমাল্য-পরা ডুবন্ত ঘোড়া।
তার হরিৎ গ্রীবা উঁচু করলে ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ে,
তার পুচ্ছের ছায়া সিক্ত করে এই বিরাট দ্বীপপুঞ্জ
আর তার অঙ্গের মধ্যে বেড়ে ওঠে পূজ্যপাদ কয়লা।
আর কখনও করবে না বলো আমাকে, ছায়া : আর কখনও করবে না
বলো আমাকে, হাত :
করবে না আমাকে, পায়ের পাতা, দরজা, পা, সংঘাত,
আর কখনও বিচলিত করবে না, বলো
জঙ্গল, রাস্তা, ধানের ছড়া, যা নীলাকার হয়ে
তোমার প্রত্যেকটি নিরন্তর ব্যবহৃত পদক্ষেপ পরিচালিত করেছে।

আকাশ, আমাকে তুমি একবার এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে যেতে দাও

আলো আর বারুদ মাড়িয়ে শিকারী বৃষ্টির নীড়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত

আমার রক্তকে ধূলিসাৎ করতে করতে যাব।

আমি যেতে চাই

সুগন্ধ তল্তেন নদীর কিনার ঘেঁষা বনের অন্তরালে,

আমি চাই কয়াতকলগুলো থেকে বেরিয়ে ভিজে জবজবে পায়ে

সরাইখানায় ঢুকতে,

চাই কাঠবাদাম গাছের বৈদ্যুতিক আলোয় পথ চিনে যেতে,

চাই গোবরগাদার পাশে লম্বা হয়ে শুতে

চাই গোধূমের গায়ে দাঁত বসাতে বসাতে মরতে এবং পুনর্জীবন পেতে।

সমুদ্র, আমাকে এনে দাও

দক্ষিণের একটি দিন, তোমার ঢেউয়ের কণ্ঠলগ্ন একটি দিন।

দাও ভিজে গাছের একটি দিন, লাগাও নীল

মেরুবাতাস আমার চুপসে-যাওয়া পালে॥

মাগেলানের হৃদয়

দূর দক্ষিণের কথা মনে প'ড়ে

রাত্রে হঠাৎ আমি জেগে উঠি।

আমার কোথায় ঘর, আমি নিজেকে জিগেস করি, ঘোড়ার ডিম,

কোথায়

আমার ঘর, আজ কী বার, কী খবর,

ধরা গলায়, স্বপ্নের মধ্যিখানে, সেই গাছ, সেই রাত্রি,

এ কে, আমি শুধোই, আমি যাই আমি বেরোই একেবারে একা,

আর চোখের পাতার মত ওঠে একটা ঢেউ, একটা দিন

তা থেকে জন্মায়, বাঘের নাক নিয়ে বিদ্যুতের কথা।

আসে দিন, এসে আমাকে বলে : 'তুমি কি শুনতে পাচ্ছ ?

ধীরে-বহা জল, নদী,

জল

ওই পাতাগোনিয়ায়?'

জবাবে আমি বলি : আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনতে পাই।

আসে দিন, এসে আমাকে বলে : 'একদল বন্য ভেড়া

ঐ দূরে, দেহাতী অঞ্চলে, পাথরের গা থেকে

হিমজমাট রং চাটছে ; শুনতে পাচ্ছ না তাদের ব্যা-ব্যা আওয়াজ,

চিনতে পারছ না'

সেই নীল দমকা হাওয়া যার হাতে পানপাত্র হয়

চাঁদ, চোখে পড়ছে না হুড়মুড় ক'রে ছোটা ঘোড়ার পাল,

হাওয়ার সেই ক্ষিপ্র আঙুল যার খালি আংটি

ছুঁয়ে আছে তরঙ্গ আর জীবন

মনে পড়ে সেই প্রণালীস্থিত

নির্জনতা

দীর্ঘ রাত্রি, যেখানেই যাই থাকে পাইন গাছ ;

এই গুমরানো বিরাগ, এই অবসাদে উল্টে দেয়

ভরা ঘট, উজাড় করে আমার জীবনের যা কিছু সব ;

এক ফোঁটা তুষার কাঁদে, আমার সন্ধানে ফেরা তার ছোট্ট ধূমকেতুর

জালজেলে জীর্ণ সাজ দেখিয়ে আমার দুয়োরে ব'সে কাঁদে,

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে

দমকা হাওয়া, বিপুল বিস্তার, গোচারণের মাঠে বাতাসের হা হা রব

কেউ কোথাও নেই এসব দেখার।

আমি এগিয়ে যাই, গিয়ে বলি, চলো আমরা যাই : দক্ষিণকে ছুঁই,

চলো বালির মধ্যে

নিজেকে ঢালি, দেখি নীরস কালো উদ্ভিদ, সমস্তই শুধু শিকড় আর

শিলা :

জলে আর আকাশে আঁচড়ানো দ্বীপমালা,

ক্ষুধা নামের নদী, অঙ্গারের অন্তঃস্থল,

শোকসাগরের অঙ্গন, আর যেখানে

হিস্ হিস্ করে একক সাপ, আর সর্বশেষ
আহত খেঁকশিয়াল গর্ত খুঁড়ে লুকোয় তার রক্তাক্ত সম্পদ।
বজ্রের সঙ্গে আমার দেখা হয়, গলায় তার বিদীর্ণ চওয়ার আওয়াজ,
প্রাচীন পুঁথির কণ্ঠস্বর, তার শত ওষ্ঠের হাঁ-মুখ
আমাকে কী যেন বলে, কী যেন যা প্রতিদিন বায়ুমণ্ডল গিলে নেয়।

আবিষ্কারকেরা আসে,
তারপর মুছে যায়

জলের সমস্তই মনে আছে কী দশা হয়েছিল সেই অর্ণবযানের।
তাদের করোটিগুলোকে আশ্রয় দেয় কঠিন পরদেশী মাটি,
দক্ষিণী আতঙ্কে তারা শক্ত করে কার্পেটের মত,
মাছদের আর শাঁড়ের চোখ দিনকে অর্পণ করে শূন্য কোটর,
দেয় তাদের আঙুলের আংটি, তাদের অদম্য জাগরণের শব্দ।
বুড়ো আকাশ পালবাদামের খোঁজ করে,
তাদের একজনও
আজ বেঁচে নেই : ভগ্নহৃদয় নাবিকের ভস্মের সঙ্গে থাকে
ডোবা অর্ণবযান, আর সোনালী খুঁটিগুলো থেকে,
মারীবীজাত্মক গন্ধের চর্মথলি থেকে,
সফরের হিম অগ্নিশিখা থেকে,
(তলদেশে নিস্তব্ধ রাতে ডুবো পাহাড়ের আর অর্ণবযানে
সে কী ঠোকাঠুকি।)
পড়ে রইল শুধু মৃতদেহ বিরহিত দগ্ধ বিস্তার,
মৃত আগুনের
এক কালো টুকরো দিয়ে
নামমাত্র ভাঙা নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা।

কেবল খাঁ খাঁ করা শূন্যতা
ভারী হয়ে থাকে।

রাত্রি, জল, বরফ আস্তে আস্তে চূর্ণ করে গোলক,
চতুঃসীমার সঙ্গে যোঝে সময় আর সমাপ্তি,

বেগনী চিহ্নাঙ্কিত, বুনো ইন্দ্রধনুর
অস্ত্রের নীল নিয়ে
আমার দেশের পদযুগ তোমার ছায়ায় নিমজ্জিত
আর দলিত গোলাপ চিৎকার করছে ব্যথায়।

আমার স্মৃতিতে
সেই প্রাচীন আবিষ্কারক

খাল বেয়ে নতুন করে যায়
হিমায়িত রসদ, লড়াইয়ের গোঁফদাড়ি,
বরফে-ঢাকা শরৎ, অস্থায়ী আহত কেউ!
যায় তাঁর সঙ্গে, সেই প্রাচীনের সঙ্গে, মৃতের সঙ্গে,
ক্ষিপ্ত জল যাকে উচ্ছে দিয়েছে
তাঁর সঙ্গে যায় তাঁর যন্ত্রণায়, তাঁর ললাটের সহযোগে।

এখনও তাঁকে অনুসরণ ক'রে ফিরছে সেই বিশাল সমুদ্রবিহঙ্গ
আর খেয়ে-ফেলা চামড়ার দড়ি, দৃষ্টির বাইরে তাঁর দুই চোখ আর
ভাঙা মাস্তুলের আড়ালে উদরস্থ ইঁদুর
দৃষ্টিহীনভাবে অবলোকন করছে ক্ষুব্ধ সমারোহ,
সেই সময় তিমিনীর গায়ের ওপর দিয়ে শূন্যতার মধ্যে
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আংটি আর হাড়।

ম্যাগেলান।

যিনি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন তিনি কোন্ দেবতা? দেখ তাঁর
দাড়িভর্তি পোকা

আর তাঁর পাতলুন আঁকড়ে রয়েছে
আর ডোবা নৌকোয় কুকুরের মত দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে
ভারাক্রান্ত হাওয়া:
তাঁর দেহযষ্টি এরই মধ্যে অভিশপ্ত গুরুভার নোঙরের মত নুয়ে পড়েছে,.

বারদরিয়া শিস্ দেয় আর উত্তুরে বাতাস
তাঁর ভিজে পায়ের দিকে ধেয়ে আসে।

সময়ের অন্ধকার ছায়া থেকে

সমুদ্রশামুক,

পোকায় কাটা নাল,

পোকাতে উপকূলের প্রবীণ দাড়াকুর, অজ্ঞাতকুলশীল
ঈগলের নীড়, নষ্ট কুয়োর জল, প্রণালীর জমির সার
আপনাকে আদেশ করছে আর আপনার বক্ষে লগ্ন রয়েছে
শুধু সমুদ্রের একটি চিৎকারধ্বনির ক্রুশচিহ্ন, একটি সাদা অন্তরব,

সামুদ্রিক আলোর

আর তীক্ষ্ণাগ্র নখরের, ডিগবাজির পর ডিগবাজি খাওয়া :
দশিসাং অঙ্কুশের।

তিনি পৌঁছোন প্রশান্ত সাগরে।

যেহেতু সর্বনেশে সমুদ্রের দিন সাঙ্গ হয় একদিন,
আর নৈশ হাত তার আঙুলগুলো একটা একটা করে কাটে
যতক্ষণ না সে শেষ হয়ে যায়, যতক্ষণ না মানুষের জন্ম হয় :
আর ক্যাপ্টেন নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেন ইস্পাত,
আর আমেরিকা তুলে তার বুদ্বুদ
আর বেলাভূমি তুলে ধরে জন্মের দরুন ঘোলাময়লা উষায় মাখামাখি
তার বিবর্ণ দাড়ি,
তারপর অর্ণবযান থেকে একটা চিৎকার ওঠে আর ডোবে
এবং তারপর আরও একটা চিৎকার আর তখন ফেনা থেকে জন্ম নেয়

প্রত্যাশের সকাল।

সবাই মারা গেছে।

জল আর উকুনের ভাই সকল, মাংসভুক গ্রহলোকের ভাই সকল,
পরিশেষে ঝড়ের ধাক্কায় মাস্তুলগাছ যে নতশির হয়েছিল,
তোমরা কি দেখেছিলে ?

ঝঞ্ঝার প্রমত্ত অকর্কিত তুষারের নিচে চূর্ণ হয়েছিল পাথর
তোমরা কি দেখেছিলে ?
যাক, এতদিনে তোমরা এখন পেলে তোমাদের হারানো ইন্দ্রলোক।
এতদিনে পেলে তোমাদের শাপান্তকারী কৌচ,
এতদিনে তোমাদের ত্রিশঙ্কু বেতালেরা
বালির ওপর সীলমাছের পদচিহ্ন চুম্বন করছে।
এতদিনে তোমাদের আংটিবিহীন আঙুলগুলোতে এল
উঁচু মালভূমির একরত্তি সূর্য, মৃত দিন
কম্পমান, ঢেউ আর পাথরের আরোগ্যশালায় ॥

মহাসমুদ্র

যদি হয় প্রতিভাত আর শ্যামল তোমার নগ্নতা,
তোমার আপেল হয় অপরিমেয়, যদি হয়
অন্ধকারে তোমার মাজরকা, তবে কোথায়
তোমার উৎস ?
রাত্রির চেয়ে মধুরতর
রাত্রি,
লবণ,
মা গো, রক্তাক্ত লবণ, উৎকীর্ণ জলজননী,
ফেনায় আর মজ্জায় মার্জনা-করা গৃহ .
নাক্ষত্র দ্রাঘিমার মহাকায় মধুরতা :
একটিমাত্র তরঙ্গ হাতে রাত্রি :
সমুদ্রঈগলের প্রতিপক্ষে বিষম ঝড়
অতলান্ত গন্ধকজাত লবণের হাতের নিচে অন্ধ :
এত বেশি রাত্রিতে ভূগর্ভের গুমঘর,
শীতল দলমণ্ডল কেবল আস্ফালন আর পরদেশে হানা,
নক্ষত্রে সবলে প্রোথিত ক্যাথিড্রাল।

রয়েছে তোমার উপকূলভাগের বয়ঃসীমায় দৌড় করা সেই রূপসী ঘোড়া,
চিমরেখার আগুনে প্রতিস্থাপিত,
রয়েছে পাখির পালকসবুজে রূপান্তরিত লাল দেবদারু,
আর তোমার হাতের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া উৎকট কাঁচের বাসন
আর দীপপুঞ্জে আক্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন গোলাপ
আর তোমার প্রতিবিম্বিত জল আর চাঁদের টোপর।

হে স্বদেশ, তোমার মাটির জন্যে
এই সমস্ত কালো আকাশ।
এই সমস্ত সর্বজনীন ফলমূল, এই সমস্ত
প্রলাপমুখর মুকুট!
তোমার জন্যে এই ফেনার পানপাত্র
বন্ধু যেখানে অন্ধ অ্যালবাট্রসের মত নিজেকে খোয়ায়,
আর যেখানে তোমার পূতপবিত্র হালচাল দেখে
উঠে আসে দক্ষিণের সূর্য॥

নতুন পতাকার নিচে পুনর্মিলন

কে মিছে কথা বলেছে? পদ্মের পা
ভাঙা, কিছুরই তল পাওয়া যাচ্ছে না, সমস্তই কানা করে দেওয়া,
সকলেরই গা-ভর্তি ক্ষত আর অন্ধকারের বাহার ঝকঝমক!
সব কিছুই, ঢেউয়ের নিয়মে ঢেউ-থেকে-ঢেউ,
স্ফটিকমণির অপাবৃত সমাধি
আর ধানছড়ার রুদ্ধ স্খলন।
এর মধ্যে আমায় পেতেছিলাম আমার বুক, সমস্ত অদৃষ্টচালিত
লবণের দিকে পেতেছিলাম কান, আমার শিকড়
আমি গাড়তে গিয়েছিলাম রাত্রে:
আমি তদন্ত করেছি মাটির তিক্ততার বিষয়ে,

আমার কাছে সমস্তই ছিল হয় যামিনী নয় দামিনী :
আমার মাথার ভেতর লাগানো ছিল গোপন মোম
আর পদচিহ্নে ছড়ানো ছিল ছাই।

আর মৃত্যুর জন্যে যদি না হবে
তবে কার জন্যে আমি টুঁড়েছি এই ঠাণ্ডা নাড়ীর স্পন্দন ?
যেখানে কেউ আমাকে শুনতে পায় না,
সেই পরিত্যক্ত অন্ধকারে কোন্ যন্ত্র আমি হারিয়েছি ?
না,
এবার সময় হয়েছে, পালাও,
রক্তের ছায়ারা
নক্ষত্রের হিমানী, মানুষের পায়ের শব্দ শুনলেই হটে এসো
আর আমার পায়ের তলা থেকে কালো ছায়াটা সরিয়ে-নাও!

মানুষের দলে আমার হাতও তেমনি জখম
আমি ধ'রে আছি একই লাল পানপাত্র
আর সমান ক্রুদ্ধ বিস্ময় :
একদিন
মানবিক স্বপ্নে
টগবগ করতে করতে
এক বুনো ঘোড়া এল
আমার সর্বগ্রাসী রাত্রে
যাতে আমি আমার নেক্ড়ে বিক্রমে
মানুষের পায়ে পায়ে যেতে পারি।
আর এইভাবে, পুনর্মিলিত,
একনিষ্ঠভাবে কেন্দ্রগত, আমি আশ্রয় খুঁজি না
কান্নার কোটরে : আমি দেখাই
মৌমাছির ভাণ্ডার : মানুষের সূর্যের জন্যে
ঝলমল করা রুটি : রক্তের দূর ব্যবধানে

একটি গোধূম দেখার জন্যে
রহস্যের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নীলিমা।

কোথায় আসন পাতা তোমার গোলাপের ?
কোন্‌খানে তোমার নক্ষত্রের চোখের পাতা ?
তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে
তোমার ঘর্মাক্ত সেই আঙুলগুলো মরীয়া হয়েছিল
বালির নাগাল পেতে ?
ওঁ শান্তি, বিষাদব্যথিত হে সূর্য,
ওঁ শান্তি, অন্ধচক্ষু হে ললাট,
জলন্ত জায়গা আছে তোমার জন্যে সড়কে,
প্রহেলিকাবর্জিত পাথর তোমাকে চোখে চোখে রাখে,
আছে পলতেক, দিগম্বর, অনুধ্যায়ী নরক,
এক ক্ষিপ্ত নক্ষত্র নিয়ে কারার নৈঃশব্দ্যমালা।

কোঁপানির মুখে একসঙ্গে হওয়া !
যথেষ্ট সময় হয়েছে
মাটির আর সুরভির, ভয়ঙ্কর লবণ থেকে সদ্যউত্থিত
এই মুখের দিকে তাকাও,
চেয়ে দেখ স্মিতহাস্যের এই তিক্ত হামুখের দিকে,
চেয়ে দেখ এই নতুন হৃদয়
সঙ্কল্পবদ্ধ আর সোনালী রঙের উপচানো ফুল নিয়ে তোমাকে সম্ভাষণ
করছে।

মাক্‌চু পিক্‌চুর শিখর থেকে

১

শূন্য জালের মতন হাওয়া থেকে হাওয়ায়
আমি গেলাম রাস্তা আর বায়ুমণ্ডল
এই দুইয়ের মাঝখান দিয়ে,
নতুন পাতার বোধন আর বিসর্জনের পর্ব নিয়ে আসা
শরতের আবির্ভাবের ভেতর দিয়ে,
বসন্ত আর গুচ্ছাকারে গোধূম
এ দুইয়ের মাঝখান দিয়ে
যেন একটা পড়ন্ত দস্তানার ভেতর,
যেখানে মহত্তম প্রেম
চাঁদের দীর্ঘ বিলম্বিত উদয়ের মত কিছু আমাদের দেয়।

(রৌদ্র ঝলকিত দিনগুলো আমি কাটাই দলবদ্ধ দেহের
ঝঞ্ঝার ভেতর :
অস্ত্রের শব্দহীনতায় রূপান্তরিত ইস্পাত :
শেষ ধূলিকণা পর্যন্ত রহস্য-অনাবৃত রাত্রি
স্বয়ংবৃত পিতৃভূমির বৃন্তসজ্জিত বেলাতট।)

বেহালার ভিড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল একজন
মাটি-চাপা-পড়া মিনারের মত সে এক পৃথিবীকে উদ্ঘাটিত করেছিল
সমস্ত ভগ্নস্বর গন্ধকবর্ণ পাতার নিচে
লীন হয়ে আছে যে মিনারের সর্পিল।
এবং আরও নিচে, খনিজ সোনার মধ্যে
উল্কার পটি জড়ানো তরবারির মত
আমি আমার সুকুমার দামালো হাত
নিমজ্জিত করেছিলাম মাটির মনোমুগ্ধকর জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে।
আমি আমার কপাল রেখেছিলাম
নিচে তরঙ্গমালায়,

জলের একটি কৌটার মত আমি গড়িয়ে গিয়েছিলাম গন্ধকময় শান্তিতে
আর যেন একজন অন্ধের মত, আমি ফিরে এলাম
কম্পিত মানবিক বসন্তকালের জুঁইফুলের কাছে।

২

ফুল যদি ফুলকে অর্পণ করে তার অন্তিম বীজ
আর পাহাড় যদি রক্ষা করে তার বিক্ষিপ্ত মুকুল
গৈরিক আর বালুকায় দলিতমথিত সাজে,
গর্জমান সমুদ্রের ভয়ঙ্কর স্রোত থেকে কুড়িয়ে এনে
আলোর পাঁপড়িগুলোকে মানুষ কুঁকড়ে মুকড়ে ফেলে
আর তার হাতের ভেতর নড়ে-চড়ে-ওঠা ধাতুকে সে গড়ন দেয়।
আর অচিরে, মুষড়ে-পড়া টেবিলের ওপর, জামাকাপড় আর ধোঁয়ার
মধিখানে, তাস-ভাঙা একটি রাশির মত,
হাতে থাকে আত্মা :
জাগরূক স্ফটিক, সমুদ্রে মর্মযাতনা
শীতের ডোবার মত : তবু
সেটাকে কষ্ট দাও আর মেরে ফেল কাগজ আর ঘৃণা দিয়ে,
দিনগুলোর গালচের ভেতর শ্বাস রোধ ক'রে মারো,
তারের বৈরী আবরণের মধ্যে ফালা ফালা ক'রে চেরো।

না : ছুটছোর, আসমান, দরিয়া বা সড়ক বরাবর
কে পাহারা দিচ্ছে তার রক্ত (টকটকে লাল আফিমফুলের মত)
ছুরিছাড়া ?
মানুষ কেনাবেচার সওদাগরদের
বিষণ্ণ পণ্যগুলোকে দলা পাকিয়ে দিয়ে গেছে করাল ক্রোধ,
যখন একটা হাজার বছরের ভেতর দিয়ে শিশির
প্রাম গাছের মাথার ওপর ফেলে গেছে তার স্বচ্ছ অক্ষর,
সেই একই অপেক্ষমাণ শাখায়, হা হৃদয়,
শরতের গুহাকন্দরে পিষ্ট হা কপাল !

কত বার যে কোনো শহরের শীতকালীন রাস্তায়, অথবা
অটোবাসে বা জাহাজে গোধূলিতে, অথবা রাত্রে, সেই নিবিড়তম
নির্জনতায় : কোনো বন্ধুসম্মেলন, ঘণ্টাধ্বনি আর সশব্দ ছায়ার নিচে,
মানবিক ভোগসুখের ঠিক সেই নকল গুম্ফাতেই, আমি চেয়েছিলাম
তখনকার মত থামতে

এবং সেই দুর্জ্ঞেয় চিরন্তন ধমনীর সন্ধান করতে
যা আমি ইতিপূর্বে ছুঁয়েছিলাম পাথরে
অথবা চুম্বনের স্খলিত বস্ত্রে।
(শস্তের দানায় থাকে অন্তহীন অঙ্কুরের স্তরে স্তরে বড় স্নেহে
'আমার কথাটি ফুরোয় না'-বলা খৈ-ফোটানো বুকের বীজকুঁড়ির
চিরকেলে গন্ধ,
আর চিরদিন সেই একভাবে একটানা চলে গজদন্তের ভেতর দিয়ে,
আর জলের দর্পণে স্পষ্ট দেখা যায়
পিতৃভূমি, বেজে ওঠার একটা ঘণ্টা, ওদিকে দূরের তুষার থেকে
এদিকে রক্ত-আঁধার করা তরঙ্গ পর্যন্ত।)

খুব বেশি হলে আমি ধরতে পেরেছিলাম একগুচ্ছ মুখ,
হঠকারী মুখোশ, যেন সোনার শূন্য আংটি,
যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জামাকাপড়, এক দুর্দান্ত শরতের বালখিল্যের দল
যারা ভয়ার্ত জাতিগুলোর শোচনীয় গাছটা ধ'রে নাড়াচ্ছে।

আমার হাত রাখার এমন কোনো জায়গা পাই নি
যা নদীর মত সাবলীল অথবা যা
পাথুরে কয়লা বা স্ফটিকখণ্ডের মত সুদৃঢ়,
যাতে আমার পৌঁছুনো হাতে ফিরে আসে উষ্ণতা অথবা শীতলতা।
মানুষ বলতে কী ছিল ? বাণী আর মালগুদামের মাঝখানে
তার প্রকাশ্যে কথার কোন্ অংশে, তার ধাতব গতিগুলোর
কোন্‌টাতে অজর, অক্ষর জীবন বাস করত ?

৩

মানুষকে মাড়াই করা হয়েছে ভুট্টার মত
জড় কৃতকাজের, দুঃখাবহ ঘটনাবলীর অন্তহীন খামারে,
প্রথম থেকে সাত পর্যন্ত, আট পর্যন্ত,
আর প্রত্যেকটিতে এসেছে একটি মৃত্যু নয়, বহু মৃত্যু :
প্রতিদিন এইটুকু এইটুকু মৃত্যু, ধুলো, কৃমিকীট, শহরতলির কাদার মধ্যে
নির্বাপিত ল্যাম্পো, একটা ছোট ধুমসো-ডানার মৃত্যু
একটা বাটকুল বল্লমের মত প্রত্যেকটি মানুষকে ফুঁড়েছে :
রুটি বা ছুরি
যেদিক দিয়েই তা মারা হোক,
হাটে যে গরু খেদিয়ে নিয়ে যায়, যে জাহাজঘাটের অন্নদাস,
যে লাঙল-ঠেলা গোলা লোক,
অথবা জটগোলে রাস্তায় যে থরথরিয়ে যায় :
তারা সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায়, তাদের সংক্ষিপ্ত দৈনিক
মৃত্যু ;
আর তাদের দিনগুলোর বিষণ্ণ ভেঙে-পড়া হয়েছে সেই বিরস পানপাত্র
যাতে তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চুমুক দিচ্ছে।

৪

পরাক্রান্ত মৃত্যু আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বহুবার :

এটা ছিল যেন তরঙ্গমালার অদৃশ্য লবণ,
আর এর অদৃশ্য স্বাদুগন্ধ থেকে যা বেরিয়ে এল,
সেটা দেখাল অর্ধেক গিরিশৃঙ্গ আর অর্ধেক হিমানী সম্প্রপাতের মত
অথবা বাতাস আর হিমবাহের বিপুল গাঁথুনির মত।
আমি এলাম যেখানে লোহের কিনারা, বায়ুর প্রণালী,
কৃষি আর পাহাড়ের কাফন,
শেষ ধাপের নাক্ষত্র শূন্যতা
আর মাথা-ঝিমঝিম-করা ঘোরালো রাজপথ :

কিন্তু বিস্তীর্ণ সাগর, ওহে মৃত্যু। তুমি তো আসো না ঢেউয়ের পর
ঢেউ হয়ে,

তুমি আসো রাত্রির মোট যোগফলের মত
নৈশ স্পষ্টতায় টগবগিয়ে।
তুমি কখনও আসো নি পকেট হাটকাতে হাটকাতে, ভাবাই যায় না
তুমি আসছ শালদোশালা না চড়িয়ে :
পরিবৃত নৈঃশব্দ্যের উষারাগের কার্পেট ছাড়া :
দুঃখের অত্যুচ্চ অথবা সমাহিত উত্তরাধিকার ছাড়া।

আমি ভাল বাসতে পারি নি প্রত্যেক সত্তার ভেতরের সেই গাছকে
যে ঘাড়ে নিয়ে আছে ক্ষুদ্রকায় তার শরৎ
(একটি হাজার পাতার মৃত্যু),
যাবতীয় ভুয়ো দেহত্যাগ আর পুনরুজ্জীবন
মর্ত্যবিহীন, পাতালবিহীন :
আমি সাঁতরে যেতে চেয়েছিলাম ব্যাপকতম জীবনের ভেতর দিয়ে,
মুক্ততম নদীর মোহানায়,
আর যখন একটু একটু ক'রে মানুষ আমাকে ফিরিয়ে দিল
আর এমনভাবে তার জায়গা আর দরজা এঁটে দিতে আরম্ভ করল যাতে
আমার প্রবহমান হাত তার আহত অনস্তিত্বে না ঠেকে,
তখন আমি চ'লে গেলাম রাস্তা থেকে রাস্তায় আর নদী থেকে নদীতে,
আর শহর থেকে শহরে আর বিছানা থেকে বিছানায়,
আর আমার নোনা মুখোশ মরুভূমি পেরিয়ে গেল,
আর সেই শেষ হতমান বাড়িগুলোতে আলো, আগুন,
রুটি, পাথর কিছু না, নৈঃশব্দ্য না, একা,
আমি গড়াগড়ি খেতে লাগলাম, নিজের মৃত্যুতে মরে যেতে যেতে।

৫

রুক্ষ পালকের পাখি, হে গম্ভীর মৃত্যু,
এইসব বাসাবাড়ির অভাগা ওয়ারিশ নাকেমুখে গুঁজে দুবেলা খাওয়ার
মাঝখানে, শুষ্ক চামড়ার নিচে

যেটাকে বয়ে নিয়ে চলেছিল, সেটা তুমি ছিলে না :
ছিল আর কিছু, উৎসর তন্ত্রীর এক ক্ষীণপ্রাণ পাপড়ি,
বুকের এক পরমাণু যা লড়াইয়ের ভেতরে যায় নি
অথবা হাকুচ তেতো শিশির যা ললাট স্পর্শ করে নি।
এটি ছিল যার পুনর্জন্ম হতে পারে নি,
শান্তিহীন বা রাজ্যহীন সেই ছোট মৃত্যুর ভাঙা একটি অংশ :
একটি হাড়, বাজাবার একটি ঘণ্টা যা লোকটির মধ্যে মারা গিয়েছিল।
আমি আয়োডিনের ব্যাণ্ডেজটা ওঠালাম, হাত ডুবিয়ে দিলাম
মৃত্যুকে হনন করা দুর্ভাগা দুঃখগুলোর মধ্যে
আর সেখানে আত্মার দুর্লক্ষ্য ফাঁকফোকরের ভেতর দিয়ে বয়ে-যাওয়া
ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝিরঝির ছাড়া আর কিছুই আমি খুঁজে পেলাম না।

৬

তখন আমি মাটির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম
হারানো অরণ্যের ভয়ঙ্কর গোলক-ধাঁধার ভেতর দিয়ে

তোমার কাছে, মাক্‌চু-পিক্‌চু।

ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া পাথরের ঢাঙা শহর,
সবশেষে, মাটি তার রাতের জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখে নি
তার মোকাম।
তোমাতে দুটি সমান্তরাল রেখার মতন
বিদ্যুৎ আর মানুষের দোলনায়
দোল দিয়ে গিয়েছিল এক কণ্টকিত হাওয়া।

পাথর মা, কন্‌ডর[১]দের মুখের ফেনা।

মানবিক প্রত্যূষের উত্তুঙ্গ শৈলশিরা।

---

১ দক্ষিণ আমেরিকার এই বিশাল শকুনের পাখার বিস্তার বারো ফুট।

আদিমকালে বালুগর্তে হারানো কুড়াল।

এই হল সেই আস্তানা, এই সেই স্থান :
এখানে উঠে এসেছিল ধাপে ধাপে ফসলের গোটা দানা
লাল শিলাবৃষ্টির মত নতুন ক'রে নেমে যাবার জন্যে।

এখানে ভিকুনা[২] মোচন করেছিল তার পশম
কবর, ভালবাসা, জননী,
রাজা, পূজাপ্রার্থনা, যোদ্ধা সবাইকে সজ্জিত করতে।

এখানে নিশাকালে সকল
ঈগলদের পা সকলের পাশে বিশ্রাম করেছিল, তাদের তুঙ্গ
মাংসাশী বিবরে, আর রাত্রি প্রভাত হলে
পায়ের নিচে মাড়িয়েছিল ফিনফিনে কুয়াশা যার পাশে বজ্রের পায়ের
প্রান্তর আর প্রস্তর ছুঁয়ে
যতক্ষণ না তাদের জেনেছিল এসেছে রাত্রি অথবা মৃত্যু।
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি জোব্বাগুলো, আর হাতগুলো,
গমগমে গুহ্ফায় জলের চিহ্ন,
দেয়াল মসৃণ হয়ে আছে একটি মুখের ছোঁয়ায়
যে মুখ আমার চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল পার্থিব বাতিগুলোর দিকে,
আমার হাত দিয়ে যে তেল সেচন করেছিল বিলীন হওয়া কাঠে :
হায় সব কিছু, পোশাক, ছাল, জালা,
কথা, মদ, রুটি
সব গত, সব ভূলুণ্ঠিত।
আর হাওয়া নারঙ্গি ফুলের আঙুল নিয়ে
বয়ে গিয়েছিল নিদ্রিতদের ওপর দিয়ে : একেকটা হাজার বছরের
হাওয়া, মাস-জোড়া, সপ্তাহ-জোড়া হাওয়া,
নীল প্রবল বাতাস, লৌহ পর্বতমালার,

২ উট পরিবারের মেষসদৃশ আলপাকা ধরনের বন্য প্রাণী।

পদক্ষেপের মৃদু ঝঞ্ঝার মত তা বয়ে গিয়েছিল
পাথরের নির্জন বাসস্থল ঘসে মেজে চকচকে ক'রে।

৭

একটি একক পাতালের প্রাচীন মৃত, একটি গিরিদরির ছায়াসমূহ,
এই গভীর টান তোমার মহত্বের পরিমাপ ;
যখন মৃত্যু এল, অখণ্ড, সর্বগ্রাসী,
তুমি কি নিচে ঝাঁপ দিয়েছিলে মর্মাহত পাথরগুলো থেকে,
লাল টকটকে রাজধানীগুলো থেকে,
আরোহী জলপ্রণালীগুলো থেকে
যেন কোনো এক শরতে,
এক একক মৃত্যুতে ?
আজ সেই কোল খালি করা বাতাস আর কাঁদে না,
তোমার মৃন্ময় পা দুটো আর চেনে না,
যখন বিদ্যুতের ছুরিতে বিদীর্ণ হত আকাশ
আর ঝড়ের দাপটে পড়া বিশাল গাছ
কুয়াশা এসে খেয়ে নিত,
তখন সেই আকাশকে ঢেকে নিত তোমার যেসব কলস
বাতাস আজ তাদের ভুলে গেছে।

উঁচুতে তোলা হাত ঝপ্ ক'রে পড়ে গেছে
শিখর থেকে সময়ের অন্তিমে।
তোমার আর অস্তিত্ব নেই, উর্ণনাভ বাহু, ভঙ্গুর
তন্তু, জড়ানো-মড়ানো কাপড়, তুমি বলতে যা কিছু ছিল
সবই ধূলিসাৎ : আচারবিচার, জীর্ণ স্বরব্যঞ্জন,
আলোর ঝাঁক থেকে বাঁচার মুখোশ।

শুধু খাড়া আছে প্রস্তর আর শব্দের এই স্থায়িত্ব :
যারা জীবিত, যারা মৃত, যারা স্তব্ধ, তাদের সকলের হাতে হাতে
উঁচু-করা

পানপাত্রের মত, এত এত মৃত্যু দিয়ে, প্রাচীর দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা
এই নগরী : এত এত জীবন থেকে উঠে আসা পাথরের পাঁপড়ি :
সুচিরকালের গোলাপ, বসবাসের জায়গা,
বরফ-জমাট উপনিবেশের এই আন্দেয়াসের প্রবাল দ্বীপ।

যখন মেটে রঙের হাত
মাটি হল, আর ছোট্ট ছোট্ট চোখের পাতা বুঁজে গেল,
ভর্তি হল কর্কশ প্রাকারে, ছেয়ে গেল প্রাসাদে,
আর যখন মানুষের সবটাই মুড়ে রাখা হল তার গর্তে,
হাতের সূক্ষ্ম কাজ থেকে গেল, আকাশে, পত পত ক'রে উড়তে লাগল :
মানুষের উদয়কালের সুমহৎ পীঠস্থান :
নৈঃশব্দ ধারণ করার সবচেয়ে উন্নতকায় আধার :
কত কত জীবনের পর একটি প্রস্তর জীবন।

৮

আমেরিকার ভালবাসা, আমার সঙ্গে ওঠো ওপরে।

আমার সঙ্গে এই গূঢ় প্রস্তরগুলো চুম্বন করো।

উরুবাম্বার ঝমঝম করা রুপো
তার পীত পেয়ালায় উড়ো পরাগকে টানে।
দ্রাক্ষার, শিলীভূত গুল্মের,
কঠিন মাল্যের শূন্যতা
পর্বতমালার চড়-খেয়ে-চুপ-করা স্তব্ধতার মাথার ওপর উঠে যায়।
এসো যৎসামান্য প্রাণ, মাটির দুই পাখার মাঝখানে,
আর, ওহে বুনো জল, স্বচ্ছ আর কনকনে,
আচ্ছামত-প্রহার-খাওয়া বাতাস, দুহাতে যোদ্ধবেশে পান্না ছড়াতে
ছড়াতে
তুষার থেকে নেমে এসো।

ভালবাসা রে ভালবাসা, যে পর্যন্ত না লুপ্ ক'রে রাত্রি নামে,
আগ্নেয়াসের অনুরণিত শৈলশিরা থেকে,
ঊষার রাঙানো জানুর অভিমুখে,
তুষারের অন্ধ তনয়কে ধ্যান করো।

সংস্কৃত তন্ত্রীর হে উইল্‌কামায়ু,
যখন তুমি তোমার রেখায়িত বল্লকে ভেঙে ফেলো
আহত তুষারের মতন সাদা ফেনায়,
যখন তোমার কুটিল বায়ুঝড় গান গাইতে গাইতে
আর ধুনে দিতে দিতে আকাশকে চাগিয়ে তোলে
তখন তোমার আগ্নেয়াসের ফেনা থেকে সন্থ উৎক্ষিপ্ত কানে
কোন্ ভাষা তুমি পৌঁছে দাও ?

কে হিমের বিজলিকে পাকড়াও করেছিল
আর শিখরগুলোর ওপর শিকলে বেঁধে তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল ?
তার বরফজমাট অশ্রু খণ্ড খণ্ড হয়ে,
তার দ্রুতবেগ বল্লমগুলো কাঁপতে কাঁপতে,
তার মারমুখো তন্তুগুলো আছড়াতে আছড়াতে
চলে গেল যেখানে যোদ্ধার সমাধি,
ভয়ে চমকে উঠে যেখানে তার পাথুরে সমাপ্তি।

চারদিক থেকে ঘেরাও হওয়া তোমার প্রতিবিম্বগুলো কী বলে ?
শুধু বিদ্রোহী তোমার বিদ্যুৎ রশ্মিগুলো আগে কখনও কি
কথার ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে ভ্রমণ করেছে ?
কে ভেঙে চুরমার করে হিমজমাট স্বরব্যঞ্জন,
প্রহেলিকার ভাষা, সোনার বরণ কেতন।
গভীর মুখগহ্বর, চাপা চিৎকার,
তোমার ক্ষীণ নাড়ীর জলের মধ্যে ?

ভ্রান্তি বেয়ে দেখতে আসা

ফুলের চোখের পাতায় কেটে কেটে চাবুকের ঘা বসায় কে ?
কে গড়িয়ে দেয় মৃত স্তবকগুলো
তোমার ঝর্নার মতন আছড়ে-পড়া হাত বেয়ে
যাতে তাদের রাতের ফসলগুলো পেটাই হয়ে
তোমার ভূগর্ভের কয়লায় পরিণত হতে পারে ?

কে ছুঁড়ে দেয় শৃঙ্খলিত শাখা পাহাড়ের খাড়াইতে
কে আবার বিদায়গুলোকে কবরস্থ করে ?

ভালবাসা, রে ভালবাসা, সীমান্তরেখা যেন ছুঁয়ো না,
যেন পুজো ক'রো না নিমজ্জিত মাথা :
সময়কে পরিপূর্ণ করতে দাও তার উচ্চতা
তার শ্বাসরুদ্ধ বসন্তের মঞ্জিলে,
এদিকে বাঁধ আর এদিকে খরস্রোত
মধ্যিখানে নিশ্বাসের বাতাস জুটিয়ে নাও স্রেফ পাহাড়ী পথ থেকে,
হাওয়ার সমান্তরাল পাতলা পর্দার ঘেরাটোপ থেকে,
গিরিশ্রেণীবিন্যাসের অন্ধ গলিপথ থেকে,
শিশিরের কটু গন্ধের কুর্নিশ থেকে,
আর চড়াই ভেঙে ওঠো, ফুল থেকে ফুলে, নিবিড়তার ভেতর দিয়ে।
বিক্ষেপিত সাপ মাড়িয়ে।

গিরিশৃঙ্গ, শিলা আর অটবী,
রেণু রেণু সবুজ নক্ষত্র, ভাস্বর জঙ্গল—
এই মণ্ডলের মধ্যে যেন একটি জীবন্ত হ্রদ
অথবা আরও একটি নৈঃশব্দ্যের স্তরের মত
বিস্ফোরিত হয় মাস্তর।

এসো আমার ঐকান্তিক সত্তায়, আমার নিজস্ব প্রত্যয়ে,
অভিষিক্ত নির্জনতা বরাবর।

মৃত রাজ্যপাট এখনও জীবন্ত।
এবং সূর্যঘড়ির আড়াআড়ি বিশাল শকুনের নির্দয় ছায়া
কালো জাহাজের মত টহল দিচ্ছে।

৯

দক্ষিণী ঈগল, কুহেলির দ্রাক্ষাক্ষেত।
হারানো বুরুজ, অন্ধচক্ষু শমশের।
তারকা মেখলা, নৈবেদ্যের রুটি।
মুগলধারা মই, অমেয় চোখের পাতা।
ত্রিকোণাকার আংরাখা, পাথরের পরাগ।
গ্রানাইটের প্রদীপ, পাথরের রুটি।
খনিজ সরীসৃপ, পাথরের গোলাপ।
জলমগ্ন জাহাজ, পাথরের ঢল।
চাঁদ-ঘোড়া, পাথরের আলো।
বিষুবীয় বর্গক্ষেত্র, পাথরের বাষ্প।
প্রান্তিক জ্যামিতি, পাথরের বই।
বাতাসে কুপিয়ে কাটা হিমশৈল।
নিমগ্ন সময়ের প্রবাল-প্রাচীর।
আঙুল দিয়ে মসৃণ দেয়াল।
পালকের ঝড়ে আক্রান্ত মাথার চাল।
প্রতিবিম্বিত গাছের ডাল, ঝড়ের ভিত্তিমূল।
পাতায় পাতায় জড়িয়ে ওল্টানো সিংহাসন।
নির্দয় নখরের রাজত্ব।
ঢালুতে নোঙর-ফেলা বায়ুঝড়।
স্তব্ধগতি আশমানী রঙের জলপ্রপাত।
ঘুমকাতুরেদের পিতৃশাসিত ঘণ্টা।
পরাভূত তুষার সমূহের শৃঙ্খল।
প্রস্তর মূর্তিতে হেলান-দেওয়া লৌহ।
অগম্য, অবরুদ্ধ কান্না।

পুষ্যি বেড়ালের হাত, রক্তপিপাসু শিলা।
ছায়াময় মিনার, তুষারময় আলাপ।
আঙুলে আর শিকড়ে উদ্ধৃত রাত্রি।
কুহেলির বাতায়ন, শিলীভূত বনকপোত।
নৈশ লতাগুল্ম, বজ্রের প্রস্তর মূর্তি।
অপরিহার্য গিরিশ্রেণীবিন্যাস, সামুদ্রিক ছাদ।
হৃত ঈগলদের স্থাপত্যশিল্প।
আকাশ-দড়ি, পাহাড়ী মধুমক্ষিকা।
রক্তমাখানো বিমান, বিনির্মিত নক্ষত্র।
খনিজ বুদ্বুদ, স্ফটিক চাঁদ।

আন্দেয়াসের সরীসৃপ, পারিজাত ভুরু।
নৈঃশব্দ্যের গম্বুজ, বিশুদ্ধ পিতৃভূমি।
সাগরের নববধূ, ক্যাথিড্রাল বৃক্ষ।
লবণ-শাখা, কৃষ্ণ-পক্ষ চেরী গাছ।
তুষারাবৃত দাঁত, হিম বজ্র।
নখরাহত চাঁদ, মারমুখী পাথর।
ঠাণ্ডা চুলের গুচ্ছ, বাতাসের ক্রিয়াকলাপ।
রজত ঢেউ, সময়ের নিশানা।

১০

পাথরের ওপর পাথর : মানুষ, কোথায় সে ছিল?
বায়ুর ওপর বায়ু : মানুষ, কোথায় সে ছিল?
সময়ের ওপর সময় : মানুষ, কোথায় সে ছিল?
তুমিও কি তখন ছিলে, নিষ্পত্তিহীন মানুষের,
ফাঁপা ঈগলের ছোট্ট ভগ্নাংশ,
যা আজকের রাস্তা দিয়ে পায়ের চিহ্ন ফেলে,
মৃত শরতের পত্রাবলী নিয়ে
কবর অবধি আত্মাকে মাড়িয়ে চলে যায়?
হায় রে হস্ত, পদ, হায় জীবন···

যার জট খোলা হয় নি সেই আলোর দিনগুলো
তোমার ওপর পড়েছে বৃষ্টির মতন
উৎসবের বান্দেরিলা[১]র ওপর, তারা কি
তাদের ভুক্তের খাবার একটির পর একটি পাপড়ি ধ'রে ধ'রে
তোমার শূন্য হামুখের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ?

কুধা, মানুষের প্রবাল,

ক্ষুধা, নিহিত গাছ, কাঠুরিয়ার বৃক্ষমূল,
হে ক্ষুধা, তোমার খাঁজকাটা শৈলশিরা কি
উঁচু উঁচু এইসব পড়ন্ত মিনার অবধি উঠেছিল ?

সড়ক পরিবহণের লবণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি,
আমাকে দেখাও চামচ, স্থাপত্যবিদ্যা, আমাকে একটা লাঠি দিয়ে
তোমার পাথরের পুংকেশরগুলো খাবলে নিতে দাও,
বায়ুমণ্ডলের সমস্ত ধাপ পেরিয়ে শূন্যতায় উঠে যেতে দাও,
তোমার অন্ত্র চাঁছতে চাঁছতে শেষ পর্যন্ত মানুষে পৌঁছুতে দাও।

মাক্‌চু পিক্‌চু, তুমি কি পেতেছিলে
পাথরের ওপর পাথর, আর একেবারে গোড়ায়, একটা ছেঁড়া কাপড় ?
কয়লার ওপর কয়লা, আর সবার নিচে, একফোঁটা চোখের জল ?
সোনার ওপর আগুন, আর তার ভেতরে কম্পমান,
রক্তের লাল বৃষ্টিবিন্দু ?
যে ক্রীতদাসকে কবর দিয়েছিলে আমায় তাকে ফিরিয়ে দাও।
মাটির গলায় পা দিয়ে বার ক'রে আনো দুর্ভাগাদের
কষ্টার্জিত রুটি, আমাকে দেখাও
ভূমিদাসের পরনের কাপড় আর তার জানলা।
বেঁচে থাকতে সে কেমন ক'রে ঘুমোত আমাকে বলো।
আমাকে বলো তার তন্দ্রার মধ্যে ফ্যাসফেঁসে শব্দ হত কিনা,
অর্ধেক হাঁ ক'রে, যেন ক্লান্তিতে দেয়ালের গায়ে
একটা কালো ফুটো।

---

১ পতাকা লাগানো এই লৌহশলাকা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ব্যবহার করা হয়।

দেয়াল, সেই দেয়াল ! আমাকে বলো মেঝের প্রত্যেকটা পাথর
তার ঘুমের ওপর ভার চাপাত কিনা, আর তার নিচে সে পড়ে
থাকত কিনা,
যেন কোনো চাঁদের নিচে থাকার মতন, মৃত্যুতুল্য ঘুমে।
হে প্রাচীন আমেরিকা, হে নিমগ্ন নববধূ,
তোমার আঙুল ও অরণ্য থেকে উত্থিত হয়ে
দেবতাদের খাড়া শূন্যতার অভিমুখে,
আলো আর মহিমার মাঙ্গলিক ধ্বজার নিচে,
দামামা আর বর্শার বজ্রনিনাদে মিশে,
তোমার আঙুলও কি, যে আঙুল
তুলে এনে লাগিয়েছে নির্বস্ত্রক গোলাপ, রূপরেখান্বিত শীতলতা,
নতুন শস্যদানার রসের ছোপ লাগা বুক, যে পর্যন্ত
বিস্ফুরিত পদার্থের উর্ণা, চিড়-ধরা পাথর,
তুমিও, নিমগ্ন আমেরিকা, তুমিও কি
অন্ত্রের অন্তরতম তিক্ততায়, ঈগলের মত,
ধারণ করো ক্ষুধা ?

১১

ধোঁয়াটে জাঁকজমকের ভেতর দিয়ে,
পাথুরে রাত্রির ভেতর দিয়ে, আমাকে ঢোকাতে দাও আমার হাত
আর হাজার বছর ধ'রে বন্দী একটি পাখির মত
যে বিস্মৃত তার প্রাচীন হৃৎপিণ্ড
আমার মধ্যে স্পন্দমান হোক।
আমি যেন ভুলে যাই আজ সাগরের চেয়েও উদার এই আনন্দ
কেননা, মানুষের বিস্তার সাগর আর তার দ্বীপপুঞ্জের চেয়েও বেশি,
আর মাটি খুঁড়ে নলকূপের মত তাকে বসাতে হয়,
ভূগর্ভ থেকে তবে উঠে আসে নিহিত জলের,
মগ্ন সত্যের একটি শাখা।
প্রশস্ত প্রস্তর, আমাকে ভুলে যেতে দাও তোমার শক্তিশালী অনুপাত,

তোমার সীমা-ছাড়ানো পরিমাপ, তোমার বহুছিদ্র পাথর,
আর আজ আমার হাত পিছলে গিয়ে পড়ুক জ্যামিতির বর্গক্ষেত্রে,
তার মর্মযাতনাকর রক্ত আর যমদণ্ডের অস্তিত্বে।
যখন, লাল শুবরের পাথায় তৈরি ঘোড়ার নালের মত, প্রচণ্ড
রামশকুন[1] তার ওড়ার ছন্দে আমার বুকে ঘা দেয়
আর সেই গৃধ্র পাখার ঝড়
ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় কোনাকুনি সিঁড়ির থমথমে ধুলো,
আমি তখন দ্রুতগতি হিংস্র পাখিকে দেখি না,
দেখি না তার বক্রনখরের অন্ধ আবর্তন,
আমি দেখি পুরাকালের লোক, ভৃত্য, মাঠে
ঘুমন্ত, আমি দেখি একটি শরীর, হাজারটা শরীর,
একজন মানুষ, হাজারটা নারী,
জলে আর রাত্রিতে বর্ণ কালি হওয়া, কালো হাওয়ার নিচে,
গুরুভার প্রস্তরমূর্তির পাশে :
হুয়ান শিল কাটা, উইরাকোচার বেটা,
হুয়ান পান্তা-খোর শ্যাম তারার বেটা,
হুয়ান খালি-পা, নীলকান্তমণির নাতি,
ওঠো, আমার সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হও, ভাই

১২

ওঠো, আমার সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হও, ভাই।

তোমার দূরবিক্ষিপ্ত দুঃখের গভীর অঞ্চল থেকে
আমাকে তোমার হাত দাও।
শিলাপুঞ্জের নিচে থেকে তুমি আর ফিরবে না।
মৃত্যুগত সময় থেকে তুমি আর ফিরবে না।

তোমার প্রস্তরকঠিন কণ্ঠস্বর আর ফিরে আসবে না।

---

১ কনডর।

তোমার ভাসা ভাসা চোখ আর ফিরে আসবে না।

মাটির অন্তর্দেশ থেকে আমার দিকে তাকাও,
ছেলে, তাঁতী, নির্বাক রাখাল :
পাখী গুয়ানাকোদের পোষ-মানানো বিষাদ :
বেপরোয়া ভারা বাঁধার রাজমজুর :
আন্দেয়াসের জল-চোখে ভিস্তিওয়ালা :
আঙুল ছেঁচে যাওয়া জহুরী :
বীজের মধ্যে বুক-ডুব-ডুব চাষী
ছড়ানো কাদামাটির মধ্যে তুমি কুমোর :
নতুন জীবনের এই পেয়ালায়
তোমাদের মাটি-দেওয়া পুরনো দুঃখশোকগুলো নিয়ে এসো।
আমাকে দেখাও তোমাদের রক্ত আর জরাচিহ্ন,
আমাকে বলো : এইখানে আমাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল,
কেননা জহরতের চেকনাই ফোটে নি অথবা জমি থেকে
ঠিক সময়ে জহরত অথবা জমির ফসল মেলে নি,
আমাকে দেখিয়ে দাও ঠিক কোন্ পাথরটার ওপর তুমি পড়ে
গিয়েছিলে :
আর কোন্ বনে তোমাকে ক্রুশকাঠে গেঁথে মারা হয়েছিল,
আমাকে তুমি আবার জ্বেলে দাও সেকেলে চকমকি,
পুরনো হাতবাতি, হাঁ-হওয়া ক্ষতমুখে
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এঁটে বসা চাবুকগুলো,
আর জেল্লাদার রক্তাক্ত কুঠারগুলো।
আমি এসেছি তোমাদের মৃত মুখের ভেতর দিয়ে কথা বলতে।
মাটির এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো
সমস্ত বিক্ষিপ্ত নির্বাক ওষ্ঠাধর জোড়া দাও
আর আমাকে নিচে থেকে বলো, সারাটা রাত ধ'রে
যেন আমি তোমাদের মধ্যে নোঙরে বাঁধা রয়েছি,
আমাকে সব কিছু বলো, একটার পর একটা শেকল ধ'রে ধ'রে,
শেকলের গাঁটগুলো ধ'রে ধ'রে, ধাপের পর ধাপ,

তোমাদের রাখা ছুরিগুলোতে ধার দাও,
আমার বুকে, আমার হাতে স্থাপন করো,
যেন হলুদ আলোর অনেক ছটার একটি নদী,
যেন মাটি চাপা পড়া বহু বাঘের একটি নদী
আর আমাকে কেঁদে ভাসাতে দাও, ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন,
বছরের পর বছর,
অন্ধ যুগের পর যুগ, নাক্ষত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী।

দাও আমাকে নৈঃশব্দ্য, জল, আশা।

দাও আমাকে সংগ্রাম, লৌহ, আগ্নেয়গিরি।

দেহগুলো, আমাকে আঁকড়ে থাকো, চুম্বকের মত।

আশ্রয় নাও আমার ধমনীতে আর আমার মুখগহ্বরে।

কথা বলো আমার শব্দাবলী আর আমার রক্তের ভেতর দিয়ে॥

।

এক রমণীদেহ

রমণীর দেহকায়, ধবল পাহাড়, শ্বেত উরু,
পৃথিবীসদৃশ তুমি, শুয়ে আত্মদানের ভঙ্গিতে।
তোমাতে কর্ষণ করছে বন্য চাষী আমার শরীর
মাটির গভীর থেকে যাতে লাফ দিয়ে ওঠে শিশু।

কোটরের মত একা ফেলে রেখে পালাত পাখিরা।
আমাকে ভাসাত রাত্রি, আক্রমণে মাড়াত দুপায়ে,
বাঁচাতে নিজেকে শেষে অস্ত্র ক'রে তুলেছি তোমাকে
আমার ধনুকে তুমি বাণ আর কোদণ্ডে বর্তুল।

ঘনাল প্রহর, নেব শোধবোধ, প্রেয়সী আমার।
ঘামের, চর্মের দেহ, ব্যগ্র দৃঢ় স্কন্ধের শরীর
ও বুকের পানপাত্র! ও অবর্তমানতার চোখ!
ও গোলাপ জঘনের! কণ্ঠস্বর মৃদু ও ব্যথিত।

হে আমার নারীদেহ, আছি লগ্ন অনুগ্রহ পেলে
অসীম পিপাসা, ইচ্ছা : দ্বিধাহীন আমার এ পথ।
অন্ধকার নদীখাতে চিরন্তন তৃষা যায় বয়ে
অতঃপর নামে ক্লান্তি, সঙ্গে আনে অন্তহীন ব্যথা॥

মাটির স্বর্গে

শুচিশুভ্র একটি মেয়ের পাশে আজকে শুয়ে ছিলাম
যেন ধবল পারাবারের সংলগ্ন বেলাভূমিতে,
জলন্ত এক নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলে
মন্থর ঠাঁই।

দীর্ঘায়িত সবুজ তার চাহনি থেকে
ঝরে পড়েছে আলো শুকনো জলের মতন,
তরুণ তাজা প্রাণশক্তির স্বচ্ছ এবং
গভীর বৃত্তে।

তার বক্ষ হুবহু দুই শিখার আগুন
উত্তোলিত দুই এলাকায় প্রজ্বলিত,
বুকে দ্বিগুণ নদীর নাগাল উদার অবাধ
পায়ের পাতায়।

জলে হাওয়ায় ধরাচ্ছে রং, পাকোচ্ছে রস
সারা অঙ্গে তার আহ্নিক দ্রাঘিমারেখা
ভরিয়ে দেয় দূরপ্রসারী ফল এবং
জাদুর আগুন॥

এই ভাই

বন্ধু কালীসাধন দাশগুপ্ত-কে

পূর্বপক্ষ

ছেলেপুলেগুলোকে থামাও তো !
ওঃ সারাটা দিন যা গেছে।
এখন একটু গড়িয়ে নিই।

কী গেল ? পাথরের সেই পুরনো মূর্তিটা ?
ইস্, ভেঙে-ভেঙে ওরা আর কিছু রাখল না।
এখনকার যে কী হাওয়া।

একটু গড়িয়ে নিই।
ওঃ সারাটা দিন যা গেছে !

মাঠে ধান রুয়েছি, পুকুরে চারামাছ।
জল হাওয়ায়, একটু রও, হাসফাস করে বাড়বে—
তারপর বায়না করে আনব
গাওনা-বাজনার দল।

ওঃ সারাটা দিন যা গেছে !

হাতে ওদের খেলনা দাও।
কানে তালা ধরে গেল ওদের চিৎকারে।

বাবাজীবনেরা, ঘরে শান্ত হয়ে বসো—
সাপ আছে, শাঁখচুন্নি আছে
অন্ধকারে যেতে নেই।

চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে
ভালো করে দেখতে হবে
হা-ঘরে হা-ভাতেদের জন্যে কী করা যায়।

সারাদিন যা গেছে,
একটু গড়িয়ে নিই॥

উত্তরপক্ষ

১

বাবা বলেন, যখন হবার
আপনিই হয়,
আসল ব্যাপার
সময়।

বাবা বলেন, সবার আগে
জানা দরকার
স্রোতে লাগে
কখন জোয়ার,
কখনই বা ভাটা।

বাবা বলেন, এমনি ক'রে
সারা রাস্তা ধৈর্য ধ'রে
মড়া টপ্‌কে
মড়া টপ্‌কে হাঁটা।

বাবারা যা বলেন তা কি ঠিক?
এও ভারি আশ্চর্য,
গা বাঁচাবার নাম দিয়েছেন সহ্য।
বাবাদের ধিক্‌
বাবাদের ধিক্‌
বাবাদের ধিক্‌।

২

আমাদের প্রাণভোমরাগুলো বড় বড় খোলের মধ্যে ভ'রে
সরু সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ;
আমরা অপেক্ষা করে আছি
মাথার ওপর বহ্নিমান হয়ে আকাশ কখন ভেঙে পড়বে।
এখন যে যতই সাফাই গাক্
হাত-ধোয়া নোংরা জল আমাদের চোখের ওপর দিয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে।
বইতে পা লেগে গেলে আগে আমরা কপালে হাত ছোঁয়াতাম,
গায়ে পা ঠেকলেও এখন আমরা প্রণাম করি না ;
এমন কাউকেই আমরা দেখছি না
যার সামনে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াতে পারি।
সরু করে বানাচ্ছি প্যাণ্ট
যাতে হাঁটু গেড়ে বসতে না হয়,
যাতে সারা দুনিয়াকে আমরা ভালো করে পা দেখাতে পারি।
আর শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেব বলেই
আমাদের জামায় ফুল-লতা-পাতা কাটার ফৌজী ব্যবস্থা।
কেউ আমাদের আদর করে ভোলাতে এলে
আমরা কাঠপুতুলের মত ঠিক্‌রে উঠি।
কানাকে কানা বলতে, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে
আমাদের মুখে একটুও আটকায় না।
ভদ্রতার মুখোশগুলো আমরা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছি,
কাউকেই আমরা নকল করতে চাই না।
যা বলবার আমরা জোর গলায় বলি,
শব্দ আমাদের ব্রহ্ম।

বাঁধা রাস্তায় পেটোর পর পেটো চম্‌কাতে-চম্‌কাতে
আমরা হাঁক দিই।
আমাদের আওয়াজে বাসুকি নড়ে উঠুক ॥

সামনের স্টপে

সামনের স্টপেই আমি নেমে যাব।
হয়ত তারপর
এ-বাস আলো করে কেউ উঠবে।
হয়ত
খুব মজার কিছু ঘটবে।

যেমন করে আমি উঠেছি
ঠিক তেমনি ক'রে
দুই কনুই দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে
আমি নেমে যাব।

গেটের কাছে একটু দাঁড়িয়ে
আমি যদি বলতে চাই :

'মশাইরা, আমাকে মাপ করবেন—
ভিড়ের মধ্যে আমি যাঁদের পা মাড়িয়েছি'

লোকে নির্ঘাৎ
ঘাড় ধরে আমাকে নামিয়ে দেবে।

তখন হাতের টিকিটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে,
আমি বলতে চাই না,
তবু আমাকে বলতেই হবে, 'বাঁচলাম'॥

পাখির চোখ

আমি মুখ ভার করে ছিলাম --
এখন
ঘাড় টান করে উঠে দাঁড়িয়েছি।

আমার হাত উঠছিল না,—
এখন
আমি টান টান করে বাঁধছি
গাণ্ডীবের ছিলা।

সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাইবন্ধুদের মাথা ;
পেছনে
আততায়ী আমার ভাই।

হে সারথি,
রথ এইখানে থামাও।
আর আমার এই বিষাদকে
একটু ধরো।

আকাশ নয়,
গাছ নয়—
পাখির চোখ ছাড়া
আমি যেন আর কিছুই না দেখি।

গাও হো

রেখে গেলে পথ
কঠিন ফলকে
এঁকে দিয়ে পদচিহ্ন।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

নদী পর্বত
পরিখা প্রাকার,
গ্রামে বন্দরে গুহা-কন্দরে
ওঠে হুঙ্কার।
শত্রুর টুঁটি ছেঁড়ে কোটি কোটি
তোমারই জাগানো সিংহ।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

মুক্তিযুদ্ধে দেখালে ভিয়েতনামের বিশ্বরূপ
হাতে হাতে দিলে তুলে
বুকের রক্তে ভেজানো রঙের তুরুপ।
সারা দেশ জাগে
আজ অতন্দ্র পাহারায়—
ভালবাসা কাছে টানে মৃত্যুকে সোহাগে
জীবনকে আজ কে হারায়?
ঘৃণার বজ্রে দেখ শত্রুর শিবির ছিন্নভিন্ন।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

ভাবতে পারছি না

চারদিকে
হিস্ হিস্ করছে সাপ ;
সারা গায়ে
দংশনের জ্বালা ।

এখন আমি ভাবতে পারছি না
মাঠটা পেরোলেই নদী
নদীর ধারে ঠাণ্ডা হাওয়া ;
আর পেছন থেকে দৌড়ে এসে কে ছোট্ট ছোট্ট নরম হাতে
আমার চোখ টিপে জানতে চাইবে,
বলো তো কে ?

আমি ভাবতে পারছি না
কেননা চারদিকে
হিস্ হিস্ করছে সাপ ,
আমার সারা গায়ে
এখন দংশনের জ্বালা

ল্যাং

ডান কানটা বিগড়ে গেলেও
বাঁ কানটা আছে
তাইতে ধরছি কে এবং কী
ছাড়ছে ধারে-কাছে —

'আপনি, মশাই, গেছেন বদলে
বদলে গেছেন, ছি ছি ।

আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁ চিঁ।

'ইনাম পেয়ে জাহান্নামে
গেছেন, বলব কী আর—
প্রগতির লোক ছিলেন আগে
এখন প্রতিক্রিয়ার।

'ফুল্‌কি ছেড়ে ফুল ধরেছেন
মিছিল ছেড়ে মেলা
দিন থাকতে মানে মানে
কাটুন এই বেলা।'

হেই গো দাদা, ছাড়ুন ঠ্যাং—
চলে যাচ্ছি ড্যাডাং ড্যাং॥

দূরত্বে

মাঝে মাঝে আমি তোমাকে পেতে চাই
চিঠি লেখার দূরত্বে,
যেখানে
আমার কথাগুলো আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে
তোমার কাছে যাবে।

আর
আমি তাদের ফেরবার অপেক্ষায়
কেবলি ঘর-বার করব
কেবলি ঘর-বার করব।

তারপর
একদিন কড়া নাড়ার শব্দে
দরজা খুলে দেখব
আমার নাম-ঠিকানায় কারা যেন দাঁড়িয়ে—

তাদের একটিও
আমার চেনামুখ নয়॥

এ ও তা

ক'রে রেখেছি বায়না
একটি হাত-আয়না
ইচ্ছেমত নাড়ব চাড়ব
যা নড়ানো যায় না।

হব যখন ছাঁটাই
পেতে সবার চাটাই
মনের ঘুড়ি প্যাঁচ খেলবে
সুতো ছাড়বে লাটাই।

কেউ কেবল ভেংচি
খালি করেছি লেঙ্কি
খানিক পরে চেয়ে দেখি
টানছি নিজের ঠ্যাং, ছি!

বলিহারি

লিখি নি যে, কারণটা তার
নয় কো দুর্বোধ্য
জানলে লেখা যায় না কি আর
রোজ দুচারটে পদ্য ?

সাধ ক'রে না-লেখার দলে
হতে চাই নি একক
কলম ঠেলি খেলার ছলে
আমি নই ঠিক লেখক ॥

আপনি জেতেন বাগিয়ে লেখা,
আমি অবিশ্যি হারি
কেল্লা ফতে করেন একা
সাবাস, বলিহারি ॥

দুয়ো

১

আমি তো আর ফটোয় তোলা ছবি নই
যে,
সারাক্ষণ হাসতেই থাকব !

আমার মুখে তো চোঙ লাগানো নেই
যে,
সারাক্ষণ গাঁক গাঁক করব !

আমার তো হাতে কুষ্ঠ হয় নি
যে,
সারাক্ষণ হাত মুঠো ক'রে রাখব।

২

জামার নিচে পৈতে আর আস্তিনের তলায়
তাবিজ ঢেকে
এক নৈকষ্য কুলীনের ছা
আমাকে পরিষ্কার বোঝাল
দুনিয়াটাকে কিভাবে বদলাতে হবে॥

বাঘবন্দী

রাস্তায় কিছু একটা হলেই
আমি বাইরে আসি,
আমার মন বলে, এইবার—
হ্যাঁ,
ঠিক এইবার সব কিছু বদলাবে।

আমি খোঁজ নিই
কোন্ মিছিল কোন্‌দিক থেকে আসছে,
আমি কান খাড়া করে শুনি
কার কী আওয়াজ।

তারপর আবার সব চুপচাপ।
শুধু শুনতে পাই
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ,
রাস্তায় শালপাতাগুলো
হাওয়া লেগে ছটফট করে।

যখন সিনেমা-ভাঙার যাত্রীদের ট্যাকে গুঁজে
রাত্রের শেষ ট্রাম
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গুমটিতে ফেরে—

ময়দানের খুব কাছ থেকে
বন্দী বাঘ খাঁচার মধ্যে ডেকে ওঠে ॥

বাইরে থেকে ভেতর

জল
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
জানলায়

ঝাপসা কাঁচ
হাত দিয়ে
থেকে থেকে মুছে দিই।

ভেতর থেকে যখনই আমি বাইরে তাকাই
দেখি
কেউ তার নিজের আকারে নেই

দেখি
সমস্তই নড়ে নড়ে যাচ্ছে
নিজের জায়গায় কেউই স্থির নয়

আমি এবার বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে
বাইরে থেকে
ভেতরটাকে দেখতে চাই।

ছুটির গান

ছুটি আমার ছুটি
বাজলে ভোঁ—
হাত ধোবো
আলগা ক'রে মুঠি।

ছুটি আমার ছুটি।
বাঁধে যে ভিড়
স্বপ্নে নীড়
তারই ডাকে জুটি।

ছুটি আমার ছুটি।
রইল ছক
যা হয় হোক
চেলে দিয়েছি ঘুঁটি

ছুটি আমার ছুটি।
তুলব ঘাড়
নামাব ভাড়
বলব, বন্ধু উঠি।

ছুটি আমার ছুটি।
টলবে পা
আরামে আঃ
বুজব চোখদুটি।

ছুটি আমার ছুটি।
ফিরে যা তৃষ্ণা
যা, পিছু নিস্ না
ফিরে যা রে হিংসুটি॥

ছাই

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এই এত বড়টা হয়েছি
এখন আর আমার
কিছুতেই কিছু হয় না

বলিহারি আক্কেল
আজকালকার সাজোয়ান ছোকরাদের

আমার পাশে বসে একজন
খটাং খট্ খটাং খট
প্রাণপণে চাইছে
বাসের জংধরা জানলাটা নামাতে

ভয়
পাছে বৃষ্টির ছাঁট লেগে
টসকে যায়

ওর ইচ্ছে
একদিকে একটা হাত আমিও লাগাই
তাহলে তাড়াতাড়ি হবে

দেখেও কিছু না দেখার ভাণ ক'রে
গ্যাট হয়ে
আমি দিব্যি বসে রয়েছি

দেখলে হে, দেখলে—
আজকালকার ছোকরাদের গোঁ !
জানলাটা বন্ধ ক'রে তবে ছাড়ল ।

বৃষ্টির বেবাক জল
এখন সেই বন্ধ জানলার শার্সিতে
কেবল তড়পাচ্ছে

ভাবখানা
যেন বাইরে গেলেই
আমাকে একহাত দেখে নেবে

ছাই !

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে আমি এত বড়টা হয়েছি
এখন আর আমার
কিছুতেই কিছু হয় না ॥

কে যায়

১

কেউ যায় না

শুধু জায়গা বদলে বদলে
সব কিছুই
জায়গা বদলে বদলে
সকলেই

থাকে ।

দেখ বাপু আমি এসেছিলাম
এই পুরনো জায়গায়

সাদা চুলে
শেষবারের মতো একবার
মিলিয়ে নিতে

ছেলেবেলার ছবিগুলো।

যেদিকেই তাকাই
জানলাগুলো
পর্দা দিয়ে ঢাকা।

ভেতরের একটা চেনা মুখও
বাইরে
আমার নজরে আসছে না।

রেলিঙের আগুন-রঙের শাড়িগুলো
পাট ক'রে
আলনায় তোলা।

রাস্তায় মাঞ্জা-দেওয়া সব সুতোই
এখন
লাটাইতে গোটানো।

দূর হোক গে —

২

পাখি উড়ে গেছে।

উড়ে গেছে আলোর নীল পাখিটা।
তাই মুখ কালো ক'রে
অভিমানে

দেয়ালে ঠিক্‌রে আছে
মরচে-ধরা লতাপাতায়
লোহার বাসরে
শূন্য খাঁচা।

আলোর নষ্টনীড়ে উধাও
মই কাঁধে উধাও
বুড়ো বাতিওয়ালা।

হায়, উড়ে গেছে নীল পাখিটা॥

দরজা থেকে এক দৌড়ে
একেবারে
মট্‌কায় উঠে গেছে সিঁড়িটা

(যেখানে পায়রার খোপ,
যেখানে তুল্‌সির টব)
আবার নাচতে নাচতে এক দৌড়ে
দোরগোড়ায়

যেখানে ঠিক তার পায়ের কাছে
ভয়ঙ্কর ভারি লোহার ঢাক্‌নায়
দম-বন্ধ-করা
সুড়ঙ্গের হাঁ-মুখ

ডাকতে গিয়ে
দরজা থেকে আমাকে ফিরে আসতে হল—
পুরনো দিনের সঙ্গীদের নাম
এখন আর
কিছুতেই আমার মনে পড়ছে না॥

৪

তাছাড়া এও এক মজা মন্দ নয়—

একদিন যেখানে ঘেরাটোপে
কলেজের বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামত
জজ সাহেবের নাতনি

সেখানে তিন জোয়ান তিন ধিঙ্গি
গল্পে গল্পে
পাড়া মাথায় করে নিয়ে চলেছে।

আমাদের কবরেজ মশাই গো—
বৈঠকখানার ফরাসবিছানা তুলে দিয়ে
তাঁর নাতিরা খুলেছে
ঠিকেদারের কেতাদুরস্ত আপিস,

আর তার কত রকমের তাম্বাই।
মুখোমুখি আয়না বসিয়ে
হাফ-দরজায়
চুলছাঁটার সেলুন

গোয়ালঘরে ছাপাখানা
উঠোনে লেদ

হরিসভার কানে তালা ধরিয়ে
টাইপ শেখার ইস্কুল—

ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে হে দুনিয়া ॥

৫

যারা ভুলে গিয়েছিল—
তারা এখন
মোমবাতিগুলো ফুঁ দিয়ে নেভাচ্ছে

তার মানে
এ-গলি একটু আগে
অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল।

ছাপাখানার চাপযন্ত্রে
গম-ভাঙার কলে
চারিদিকে আবার সব
গমগম করছে।

তার মানে
একটু আগে এলে

এক নিষ্প্রদীপ নৈঃশব্দ্যে

আমি দেখতে পেতাম
মাথার ওপর
অনন্তনীলচক্র

কান পাতলে শুনতে পেতাম
উৎসে ফিরে যাবার
ছলাৎছল শব্দ।

আমি পেছন ফিরতেই
কোথাও গনগনে আঁচে
কিছু একটা সাঁতলাবার আওয়াজে

হঠাৎ এ-গলির বুকটা
ছাঁৎ করে উঠল।

জল আসুক

১

সারাদিন গুম হয়ে থাকার পর
আকাশের মুখের ভাব
বদলে গেল—

এবার
যেন একটা কঠিন সংকল্পে
মন বেঁধে নিয়েছে।

সভায় কোনো বেআইনি দলের
অতর্কিতে ছুঁড়ে-দেওয়া
উত্তেজক ইস্তাহারের মতন

শূন্যে
ভর দিয়ে দিয়ে
নামছে

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না
জানলার গরাদের ওপারে
কিসের
ফিস্-ফাস্ ফিস্-ফাস্ শব্দ।

থেকে থেকে
ঠাণ্ডা, এলোমেলো হাওয়া।

যেন কিছুর অপেক্ষায়
পর্দাটা
সেই কখন থেকে
কেবলি ঘর-বার ঘর-বার করছে॥

২

হে জলের দেবতা
তুমি কোথায় ?

লোকে অবলীলাক্রমে হেঁটে পার হচ্ছে নদী—
আমাদের পুকুরগুলোতে পাক .
কুয়োর এই ঘোলা জল,
হে দেবতা,
আর যে আমরা মুখে দিতে পারছি না।

তোমার পায়ে পড়ি, এই মোড়লগুলোকে নাও।
একে ওরা মুড়িয়ে খাচ্ছে,
তার ওপর গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আমাদের রাখছে না।

বরং পাঠিয়ে দাও কিছু বেবুন।
আমরা ওদের নুনজল খাইয়ে তৃষ্ণার্ত করলে
ওরা ঠিক জল বার করবে।
মাটি থেকে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে কন্দ।

হে জলের দেবতা,
তুমি কোথায় ?

এই ভাই

দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এই ভাই,

আমাকে একটু পাশ দিন

বেরিয়ে যাই।

বেরিয়ে

কোথায় যাব ?

বনে বনে দাবানল,

খোলা হাওয়া কোথাও

নেই, কোথাও

নেই।

মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলিয়ে

শূন্যে

অহর্নিশ

শূন্যে

অহর্নিশ

পাক দিচ্ছে প্রলয়।

আর পাথরের দেয়ালে

পিঠ

ক্ষতবিক্ষত ক'রে

আমরা এ ওকে

সে তাকে

নখ দিয়ে খুঁড়ছি

দিন রাত খুঁড়ছি
দিন রাত খুঁড়ছি
রাতদিন খুঁড়ছি ॥

এক অস্থায়ী চিত্র

বাঁশির শব্দে
সবুজ আলোয়
আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন।

প্ল্যাটফর্মের খালি বেঞ্চে, মনে করুন, আপনি একা
বসে বসে
শুধুমাত্র দেখছেন।

সামনেই
যেখানে যার থাকার কথা
নিজের নিজের জায়গায়

কেউ নেই।

কাছের মানুষ
মায়া কাটিয়ে
চলেছে দূর পাল্লায়।

তাকিয়ে দেখুন,
এক মুহূর্তে সমস্ত মুখ
ভিড় করেছে জানলায়—

বুকের কাছে ফুলের গুচ্ছে
নড়ছে কাছে-থাকার ইচ্ছে
ওঠানো হাত বিদায় নিচ্ছে

রুমাল উড়ছে
রুমাল উড়ছে।
হঠাৎ—

দাঁড়িয়ে গিয়ে
স্টেশনের সেই স্থিরচিত্র নড়িয়ে দিল
ট্রেন।

টেনেছিল
নিশ্চয় কেউ চেন।

আপনি তখন তাকিয়ে দেখছেন—

থেমে যাওয়ার এ-বিকৃতি
ধুলোয় ফেলে দিয়েছে স্মৃতি
খুঁজছে সবাই
পরস্পরকে ফেলে পালানোর জো

তবেই দেখুন,
সময়মত যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য॥

এইও

১
আমি তখন ঘাড় হেঁট ক'রে
কুয়োর স্থির জলে
নিপুণ হয়ে দেখছিলাম
নিজেকে।

ছায়া থেকে স্মৃতি
স্মৃতি থেকে স্বপ্নে
আমার চোখ
আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এল।

আরেকটু হলেই আমি কিন্তু
আমার ছায়াসমেত তলিয়ে যেতাম।

দেখতে গিয়ে
কখন
নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম
বুঝি নি।

বুক টান ক'রে
এখন
আমি উঠে দাঁড়িয়েছি।
আমার চোখ জড়িয়ে গিয়েছিল ;
খুলে নিয়েছি।

চোখের সামনে থেকে নিজেকে সরাতেই—

আমার গোচরে
এখন
সমস্ত চরাচর,
সারা পৃথিবী
এখন আমার নজরবন্দী॥

২
রংচঙে ফানুসগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে
আমাদের মাথার ওপর
ঝোলানো হচ্ছে গাঁড়া—

এইও !
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

পড়ো-পড়ো দেয়ালগুলোতে
নতুন পলেস্তারা লাগিয়ে
ভাড়াটেদের অভয় দেওয়া হচ্ছে—

এইও !
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

দলের ভেতর দল পাকিয়ে
গদি দখলের গুজগুজ ফুসফুস

এইও !
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

এবার আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে
সব
নড়িয়ে-চড়িয়ে তোলপাড় ক'রে
নিজের ছায়াটাকে পৃথিবীর গায়
ঢেলে সাজব ॥

তাঁর ইচ্ছেয়

বলল :
যাও, ঠুক্‌রে দাও।
আমি ঘাড় নাড়তে নাড়তে
ঠুক্‌রে দিয়ে এলাম।

বলল :

যাও, খুব করে শুনিয়ে দাও।

কে কার কে

কে কার কে

ব'লে

লাল ঝুঁটি নেড়ে নেড়ে

আমি যা ইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিলাম।

তারপর আমার গলাটা ধ'রে

আড়াই পোঁচে

শরীরটা থেকে আলাদা ক'রে

বলা হল : বহুৎ আচ্ছা,

এবার নাচো।

মাটির ওপর সমানে ধুলো উড়িয়ে

নাচতে লাগলাম

ঝটপট ঝটপট !

সব তারই ইচ্ছেয়॥

খেলা

খেলাটা যাদের কাছে জুয়ো—

তারা

কেউ দেবে তুয়ো,

কেউ বলবে,

'সাবাস, সাবাস ! বলিহারি !'

বাঁশি বাজলে
দৌড়ে এসে বল কুড়োবে
জাল গোটাবে মালী।

যদি হারি
আমি তাঁবু পোড়াতে ছুটব না—

খেলার আনন্দে
দেব
সশব্দে হাততালি॥

এমনি ক'রে

এমনি ক'রে যায় দিন
এমনি ক'রে যায়

ডাইনে-বাঁয়ে বাঁধ দিয়ে
নদী
রাখতে পারে নাকো ঢেউ
একটিও বজায়।

এমনি ক'রে দিন যায়
এমনি ক'রে দিন।

তার চেয়ে সহৃদয় কেউ
ডাইনে-বাঁয়ে
ডানা দিত যদি
হতাম উড্ডীন।

এই ভেবে দিন যায়,
দিন যায়
দিন ॥

একাকার

দেশসুদ্ধ লোক যতদিন
খেতে পায় নি
কমলালেবু—
খান নি লেনিন

এই গল্প
বলেছিলেন ধর্মভীরু বাবার বন্ধু
আমার তখন বয়স অল্প

পরে যখন বড় হলাম
পৃথিবী আর কমলালেবুর
এক আকারে
জড়িয়ে গেল লেনিনের নাম

চতুর্দিকে তুমুল তর্ক
কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে
কমলালেবুর ছবিও নাকি
খাপ খায় না ভূগোলচিত্রে

আমার কাছে ছেলেবেলার
সেই গল্পই চিরসত্য
পৃথিবী আর কমলালেবুর
এক আকারে
লেনিনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব ॥

গাছ পাখি মাঠ ঘাট হাট দেখে
আসছিলাম চলে—

হঠাৎ পিছন থেকে
কে যেন চিৎকার করে ডাকতে লাগল
"কমোরে-ড!" 'কমোরে-ড!' ব'লে।

ফিরে দেখি চেনামুখ
দেখে থাকব হয়ত কোনো মিছিলে-মিটিঙে.
মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি
ভাঙা গাল, একেবারে রোগা টিঙটিঙে
খাটো ধুতি, মার্কামারা খাকির হাফশার্ট।

কাছে যেতে মনে পড়ে গেল অকস্মাৎ—
এক সময় আমরা সব
একই জেলে একসঙ্গে ছিলাম.
মুখচ্ছবি মনে ছিল .
কিছুতেই মনে করতে পারলাম না নাম।
আমার কপাল,
স্মৃতির অ্যালবামে যত ছবি।
সব নাম-মোছা।

বেঞ্চিতে বসলাম আমরা
এসে গেল তক্ষুনি দুটো চা—
গরম গেলাস দুটো ভাঙাচোরা টেবিলে বসিয়ে
পুরনো দিনের গল্প, সেও খুব রসিয়ে রসিয়ে,
বলা হল।
দাঁতে দাঁত দিয়ে সব ব'সে থাকা
কিছুতে না-খাওয়া,

সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বারান্দায় জল ঢেলে রাখা
টিয়ার গ্যাসের জন্যে, সারা রাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি —
তবু কী আনন্দে, ভাবো,
কেটেছিল জীবনের সেই দিনগুলি।
বলতে বলতে জল আসে আমাদের দুজনেরই চোখে।
মুখগুলো ভেসে ওঠে, মনে পড়ে
প্রভাত-মুকুল-প্রমথকে।

তারপর ওঠে
আজকের দিনের কথা।
কে কোথায় আছে,
কে কী করছে —এই সব। দেখা গেল,
ভয়টা ছোঁয়াচে।

দুজনেই চুপ, কিছু ভাঙতে চায় না দুজনের কেউ।
কে আজ কোথায় আছি কোনদিকে
কোন্ তরফে— যেই বলা,
অমনি প্রকাণ্ড একটা ঢেউ
ছুটে এসে
দুহাতে দুজনকে তুলে
দিলে এক প্রচণ্ড আছাড়।

সামনে দেয়াল শুধু,
লোহার গরাদে ধরে
বাইরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার।
চেয়ে দেখি, আমরা আবার সেই পাশাপাশি সেলে।

নিজেদের জালে বন্দী; নিজেদেরেই তৈরি-করা জেলে।

ভাল লাগছে না

আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না—

এ জন্যে নয় যে,
দু দুটো যুদ্ধের পরেও
স্বাধীনতার যুদ্ধে আজও
মানুষ মাছির মতো মরছে।

আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না—

এ জন্যে নয় যে,
সভ্যতার মুখোশ খসিয়ে ফেলে
শয়তান বর্বরের দল
হিংস্রতায় জানোয়ারদেরও হার মানাচ্ছে।

আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না—

এই জন্যে যে,
রাক্ষসদের হাড় একদিকে, মাস একদিকে করতে পারে
রক্তবীজের বংশধর যে মানুষ
থমকে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে
রামলক্ষ্মণের চুলোচুলি।

আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না—

যখন দেখছি
আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে
ভিয়েতনামকে ভাই বলছি॥

সুখে থাকো

রোদে জ্বলছে জি-টি রোড।
ইঞ্জিনের গো গো শব্দে ডুবছে উঠছে বিড়ির দোকানে
আলী আকবরের স্বরোদ।
'যাবে গো' 'যাবে গো' ব'লে হাঁক দিচ্ছে সমানে ক্লীনার।

চটপট চা-পান সেরে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ভাঁড়
ড্রাইভার ব'সেছে সাটে,
ঠিক তার পাশটিতে মুখ টিপে দাঁড়িয়ে
সূর্যদেব নিজমুখ দেখছেন আরশিতে
সমানে কাতরাচ্ছে হর্ন্
ভ্যাপ্‌পো ভ্যাপ্‌পো ভ্যাপো।

ভেতরে প্রচণ্ড ভিড়: বেঞ্চি জুড়ে কোলে-পো কাঁখে-পো
অস্থিসার
ষষ্ঠী মা-ঠাকরুন।
এ-কোণে বড়াই বুড়ি নিজে বাছচে মাথার উকুন।
পাশে এক ম্লেচ্ছ ব'সে—
তাই

প্যাঁচার মতন মুখ করে ঠেলছে
নামাবলী-গায়ে-দেওয়া পুরুতমশাই।

পা তুলে একাদবেঁকে, ধুতি তুলে হাঁটুর ওপর,
পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি, কোলে ট্রানজিস্টর রেডিও,
হাতে ছোট সাইজের টোপর;
জানা গেল, ষষ্ঠ ছেলেটির ভাত এবং তৎসহ
ল্যাংড়া আম বড় ভালবাসেন বি-ডি-ও।
ছুটিতে শহর ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছে
নাইটের ছাত্র কিংবা কেরানি ওরফে—
সকলমে 'বি-ও-এ-সি' 'কে-এল-এম' রোমান হরফে।
এবার সত্যিই ছাড়ছে ; ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রবল।
নেমে যাচ্ছে কমলালেবু, ঠাণ্ডা জল, চুল-বাঁধার ফিতে,
খনার বচন, ছুঁচ, সেফটিপিন
এবং গোপালভাঁড়, খেলনার পিস্তল।

হঠাৎ ক্লীনার চুপ,
ড্রাইভার পেছন ফিরে আড়চোখে তাকালো,
বাঁ-হাত গীয়ারে স্তব্ধ, বোঁটাসুদ্ধ চুন ডান হাতে—
সকলে উৎসুক।

উঠে এল বীরদর্পে
অপরূপ
অনবদ্য মুখ

টিনের সুটকেস নেড়ে 'সুখে থাকো' লেখাটুকু
দোলাতে দোলাতে॥

নিমতলার ছায়া

এ পথে কচিৎ কদাচিৎ যায়
পোর্ট কমিশনারের রেল।

কাঠের স্লীপারে শুয়ে সারবন্দী
দুপুরে গড়ায়
রোদে-দেওয়া গেঞ্জি গামছা জাঙিয়া মেরজাই।

গলায় গর্দানে কণ্ঠী
মুণ্ডিতমস্তক চিংড়িহাটার মড়েল
(ধাড় নোয়ালে
অবিকল কচ্ছপ !)
যেতে যেতে সেরে নেয় আর্দ্রবসনে ইষ্টনাম জপ—
রেলের লাইনে রেখে
গঙ্গাজলে সত্যস্নাত খাঁচাসুদ্ধ টিয়া।

বলহরি হরিবোলে
আরো একদল এসে কাঁধ থেকে ইতিমধ্যে নামাল খাটিয়া।
শানের ওপরে কাঠকয়লার আঁচড়ে
বাঘবন্দীর ঘর কাটা ;
চোখ গুলিভাঁটা
সমানে কল্‌কেয় তোলে
নিভে-আসা চুল্লির আগুন।

ডোমের মেয়েরা বাছে পা ছড়িয়ে ব'সে
এ ওর উকুন।

মাঝিরা ঘুর ঘুর করছে,
জলে ধুচ্ছে ইলিশের জাল।
এ-ডাল ও-ডাল

লেগে থেকে সারাক্ষণ এ ওর পিছনে
চোর-পুলিশ
খেলছে ডুটো কিছে।

আঁটিবাঁধা ভিজে খড়
ডাঙার রেলিঙে
সার বেঁধে বসে খাচ্ছে হাওয়া—
পর্বতপ্রমাণ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে
অদূরে খড়ের নৌকো।

ইনিয়ে বিনিয়ে
যত দুলছে জোয়ারের জলে
ছিন্নভিন্ন ছায়া

আমাদের হাতে

মার্কিনী গ্রামের অগম নিগমে
কু ক্লক্স শেখায়
ওদের সদ্গুরু।

পয়সা দিয়ে ময়দানে ভিড় জমিয়ে
ওদের কালো চশমা
দিনকে রাত করে।

ওদের বাঁধানো দাঁতের কথাগুলো
বন্দুকের অনর্গল ধোঁয়ায়
বিলক্ষণ পরিষ্কার—
দুর্গাপুরে ফিন্‌কি-দেওয়া রক্তের ধারায়
ঠিক
জলের মতন সহজ।

আমাদের চোখ যত খোলে
মুঠো তত শক্ত হয় ।

ওরা বেচতে চেয়েছিল ডলারে,
আমার বুকের রক্ত দিয়ে
কিনে নিয়েছি ।

ওরা ফেলে দিয়েছিল,
আমরা তুলে নিয়েছি ।

স্বাধীনতার পতাকা, দেশ—
এখন
আমাদের হাতে ॥

হতেই হবে

নৌকোয় জল উঠছিল সমানে ;
আর আমরা সেই জল
ছেঁচতে ছেঁচতে চলেছিলাম ।
অন্ধকারে ঠাহর হচ্ছিল না কোনদিকে ডাঙা
সূচিমুখ বৃষ্টির ফোঁটায়
ঝাঁঝরা হচ্ছিল আমাদের ফুসফুস ।
ঠাণ্ডায় হাতে পায়ে খিল ধরে এলেও
আমরা থামি নি ।

তারপর ?

তারপর আকাশে রোদ হাসল,
তারপর পারে এসে উঠলাম ।

এই রকম্ হয়,
এ রকম হতেই হয়।
নইলে কিসের জীবন
আর মানুষই বা কেন ?

নজরুল, তোমাকে

ফুলের ফুরফুরে হাওয়া,
বনে মৌমাছির গুন্‌গুন্‌
—সমস্তই সাময়িক,
সারা বছরের ছবি নয়।

এও ঠিক,
সময় সময়
খর সূর্য
বর্ষায় আগুন।

কখনও কখনও
মাথার ওপর
মেঘ ডাকলে
ঘন ঘন চমকায় বিদ্যুৎ
উঠে আসে ঝড়।

যখন বাতাসে ঘূর্ণি
টান লাগে শিকড়ে শিকড়ে
তখন তোমাকে মনে পড়ে।

খুঁজি না রাস্তায় নামে,
জানি নেই মর্মর মূর্তিতে—
তুমি থাকবে, তুমি আছ,
আমাদের নিত্য দুঃখজয়ের সংগ্রামে॥

পটলডাঙার পাঁচালী যাঁর

এমন মানুষ পাওয়া শক্ত
লেখার রাজ্য ঢুঁড়ে
এই নিচ্ছেন এবং কলম
এই ফেলছেন ছুঁড়ে

মাথায় আকাশ-ছোঁয়া যদিও
মাটিতে পা রাখেন
জমি জরিপ করেন আগে
পরে নক্‌শা আঁকেন।
ছদ্মনামে ছাড়িয়ে যান
মান্ধাতারও আমল
একালেও দেয় পাহারা যাঁর
নীলকমল লালকমল॥

যা চাই

এখনও অনেক দেরি
বসন্তের গলায় ঝুলিয়ে দিতে মালা—
জানি না অজ্ঞাতবাসে আর কতকাল করবে
প্রতীক্ষা ফাল্গুন।

আকাশ দুহাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ,
চোখে বিদ্যুতের জ্বালা;
থেকে থেকে
অন্ধকারে জ্বলে ওঠে জোনাকির শরীরে আগুন

আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র.
কাল নিরবধি।
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের,
পায়ের পাতায় লেগে লেগে
মাটি ভাঙে.
কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায়
নদী।
আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই
কলকল্লোলিত সে আবেগে।

তোমাকে যে কথা আমি বলতে গিয়ে
হার মেনে
ফিরে ফিরে আসি:
কানে কানে গুন গুন্ ক'রে বলা যেত
যদি আমি
হতাম ভ্রমর।
এখন অনেক দূর থেকে
একা
মনে মনে বলছি আমি:
'ভালবাসি'।
তুমি শুনতে পেলে?

কোনো দৈববাণী?
অথবা আমার কণ্ঠস্বর?

এ সংসারে
দিনে রাত্রে
দেহ বলো, মন বলো
যখন যা চাই—
প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা,
করো সব কিছুর যাচাই ॥

নাটক

সুযোগ এবং সুবিধায়
সমানে সমান হোক দশ ভাই
কেন পাবে কেউ খুব বেশি, কেউ
খুব কম ?

যারা এই কথা ভাবল—
ছিল না তাদের শুধু হাত, শুধু কলম।
যেই তারা সারা পৃথিবীটাকেই
ঢেলে সাজবার পক্ষে
হাতেকলমেও হাজির করল প্রমাণ—

অমনি তাদের
থাকল না আর রক্ষে।
রাজার বাড়িতে রব উঠে গেল সাজ-সাজ ;
ছোটে চৌদিকে লাঠিয়াল বরকন্দাজ।

হাতে নিয়ে পরোয়ানা
কড়া নাড়তেই
দরজায় যায় দেখা—
এসে দাঁড়িয়েছে ভাই-দাদা-বাবা-কাকা।

কার হাতে হাতকড়া লাগাবে সে
কাকে সে করবে আটক ?

তখন সে এক নাটক ॥

সর্ষে

ডেকে বলে এক চোট্টা,
'আরে রামো রামো,
বাড়ি বাড়ি ঘুরে কেন মিছে ঘামো—
তার চেয়ে এসো
নিয়ে য'ও এই নোট্‌টা।'

তারপর কিবা ধুমধড়াক্কা
চারমণ তেল পুড়ল পাক্কা।
লারে-লাপ্পায় কানে তাঁ লাগিয়ে
জোরসে
চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলল সর্ষে

হুঁশ হতে দেখি ধুরন্ধর সে চোট্টা
মেরে নিয়ে গেছে
আগামীবারের ভোটটা ॥

ছত্রী

ঘরের বাইরে হুড়ুম দুড়ুম
শুনতে পাচ্ছি আওয়াজ।
সারাটা দিন যেন কাদের
চলেছে কুচকাওয়াজ।
বিকেল হলে। বেলা চারটে নাগাদ।
জানলা দিয়ে তাকাই—

আয়ে আরে হল একি!
বিরাট সেই বাহিনী দেখি
খুলে ফেলেছে যে যার কালো খাপ।

ভয়ে চম্‌কে উঠে
দুপাশ থেকে খসে পড়ল
দু তিন জোড়া ইয়া লম্বা সাপ।

তারপরেতে সটান
যা থাকে কুলকপালে ব'লে
বিরাট সেই বাহিনী যেই
মাটিতে দিল লাফ—

মহানন্দে ধরে ফেলল ঠ্যাং
পুকুরপাড়ে অপেক্ষমাণ
হাজার কুড়ি ব্যাং॥

পুপের নয়

গড়গড়িয়ে রেলের গাড়ি
পুপে গেছে মামার বাড়ি।
পুপের মা পালোয়ান
গায়ে জড়িয়ে আলোয়ান

ধুঁকছে—

ব'লে উঠল ময়না
পুপের আজ নয় না ?
মামা করছে আয়েস
মামী রাঁধছে পায়েস।

পুপে বেড়ায় এদিক ওদিক
কিন্তু তার চেয়ে অধিক

গুঁকছে—

পুপের বাবা
বাড়িয়ে থাবা॥

সিনেমামা

এক ডুব
দুই ডুব
তিন ডুব দেবার কালে—

উঠে এল
ছবি যে এক
পুপের মা-র জালে।

দেখে পুপে লাফায়
কড়ায় তেল চাপায়।

কোথেকে
এক কুমির এসে
পুরে ফেলল গালে॥

পুপের মা-র গল্প

সন্ধেটা তার ভরতেই হয়
গল্পেতে
পুপে কিছুতেই খুশি নয়
অল্পেতে।

পুপের মা কী করে—
কল্‌কেতা শহরে!
উঠে ভোরে
গল্প পড়ে
কল পেতে।
গল্পগুলো জ্যান্ত
পুপে সেটা জানত।
এক সন্ধে
গেল ডুবে
জল কেটে।

কেন দিল রাগিয়ে
পুপে ঘুষি বাগিয়ে
কপালদোষে
মারল ক'ষে
তলপেটে।

বদ্যি এল ছুটে,
ব্যাপার বিদ্ঘুটে—
দেখে ছুটো
বড় ফুটো
কল্জেতে।
বদ্যি ছিল রক্ষা
নইলে পেত অক্কা
ঘড়ি ঘড়ি
খেল বড়ি
খল চেটে।

সাম্‌লে সেই ধাক্কা
দুটি মাস পাক্কা
লেগে গেল
গায়ে ভালো
বল পেতে।

পুপে মুখ শুকিয়ে
দেখে যেত লুকিয়ে
কাঁচের গ্লাসে
চাইছে না যে
ঘোল খেতে।

সেদিন পুপে অবাক! দেখে
গন্নটি
সরিয়ে ফেলে কপাল থেকে
জল-পটি—

উঠে কাঠের মইতে
পুপের মা-র বইতে

যত ইচ্ছে
টান দিচ্ছে
কলকেতে ॥

তানসেন গুলি

হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে—
দেখলেন তো, টিপ!
চারের গোলা জলের ঠিক কোন্ জায়গায় পড়ল
শিখুন, শিখে নিন!
বুড়ো হাড়ে, এখনও ভেল্‌কি খেলে, মশাই—
দেখলেন তো
কব্জির জোর!

চারগুলো এখন ডুবে-ডুবে ডুবে-ডুবে
টোপের মুখ বরাবর
ফুসলে আনবে।
আহা, কী চার! কী গন্ধ!
কার হাতের মাথা দেখতে হবে তো!

হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে—
দেখলেন তো, আমার সেরেস্তা
সইবহরে একেবারে সেই কোন্‌খানে গিয়ে পড়ল।
শিখুন, শিখে নিন!
দেখলেন তো কব্জির জোর!
এক কাঁটায় পিটুলি, এক কাঁটায় রুটি;
মাছ গপ্ গপ্ ক'রে খাবে।
কাৎনা ডুবিয়েছে কি টেনেছি

আর একবার দেখে নেবেন তখন কব্জির জোর।।
তারপর হাঁটতে হাঁটতে
হাঁটতে হাঁটতে
হাতিবাগানে মিষ্টি
নিউমার্কেটে শাড়ি

তারপর বাড়ি।
হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে॥

রোমাঞ্চ-সিরিজ

আদরে মাথায় চড়ে গিয়েছে রামখোকা
এখন নামাতে গিয়ে মাথাটাই কাটা
যায়, দাদা! সময়ে বোঝো নি কেন পোকা?

কাজ ফুরোতেই পাজা যে ছিল পা-চাটা!
তুমি যে ঢাকের বাঁয়া ছিলে তার, বোকা।
শ্রীমুখে খেউড় শুনতে গায়ে দিত কাঁটা।

বিষবৃক্ষে ভয় পাও? তোমারি তো বীজ।
পয়দা করো বাদশা আর বেগমসাহেবা
হাতে গণতান্ত্রিকের কবচ-তাবিজ।

গাছে তুলে মই কাড়ছ এখন বাবে বা!
দল থেকে করো যাকে যতই খারিজ,
অন্ধকারে, গজদন্তে তৈরি মিনারে বা

চলছে চলবে মঞ্চে তার রোমাঞ্চ সিরিজ॥

বাড়িয়ে বাড়িয়ে

পা বাড়ালেই
　　পিচ-ঢালা রাস্তা

আমরা চলে' চলে'
চলে' চলে'
　　ক্ষইয়ে ফেলেছি

চাপা-পড়া খোয়াগুলো
উঠে উঠে
এখন পদে পদে
　　আমাদের রুখছে।

হাত বাড়ালেই .
　　প্রাণঢালা ভালবাসা

আমরা চেয়ে চেয়ে
চেয়ে চেয়ে
　　ফুরিয়ে ফেলেছি

চাপা-পড়া কথাগুলো
উঠে উঠে
এখন পলে পলে
　　আমাদের বিঁধছে।

একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্যে
মনে মনে
তাকে সাহস দিচ্ছি।

ভারী দুরমুশ পেটাবার শব্দে
আমার বুকের ঘড়িতে বেজে চলেছে
টিক্
টিক্
টিক্ ।

লোকটা উঠছে না ।

ড্রাইভার মুঠো ক'রে ধরেছে গিয়ার
কণ্ডাক্টরের হাতে ফাঁসির দড়ি
আমার বুকের ঘড়িতে
টিক
টিক
টিক ।

লোকটার হাতে মাত্র
চোখের এক পলক সময় ॥

দেখ মাস্টের

সাদা । কালো
কালো । সাদা

চৌষট্টির টানাপোড়েনে
বারো কুঠুরির বেড়াজাল
তার মধ্যে জমিয়ে আসর
চার কামরার দমঘর

সেইখানে জোর যার
মুলুক তার।

সব বল বার করেছি হে
রাজাকে পুরেছি কেল্লায়
বড়েগুলোকে টিপে দিয়েছি
ঘর বরাবর সামনে

মন্ত্রী ধরেও পার পাবে না হে
ঘুঘু পড়েছ ফাঁদে

এই চালে চা
এই চালে চট

দেখ মাস্টের,
গা-ঢাকা দেওয়া উঁঠকিস্তিতে
এই বার
শেষ চালে তোমাকে কেমন মাৎ করি।

শুধু আজ ব'লে নয়

শুধু
আজ ব'লে নয়—

রোজ

আমি তো হাসতেই চাই
আমারই গরজ।

ফুল কিনতে
পায়ে হেঁটে যে পয়সা বাঁচাই,
রেখে আসতে হয়
পথ জুড়ে হাঘরে হাভাতে
অহিংসার হাতে।

শুধু
আজ ব'লে নয়—

খালি

আমি তো দিতেই চাই
আনন্দে হাততালি।

স্বপ্ন বন্দী
যে করেছে লাভ আর লোভের খাঁচায়
বাঁধা রাখতে হয়
১০ তার কাছে সব গান
কলকারখানা খনি বাগিচা বাগান।

শুধু
আজ ব'লে নয়

রোজ

আমি তো বাঁচতেই চাই
আমারই গরজ।

তাই
স্বাধীনতা বুকে ক'রে

অক্ষরে অক্ষরে
আমার লড়াই ॥

জলদি জলদি

জলদি জলদি···
হ্যাট হ্যাট
জলদি জলদি

এখন একটু পা চালিয়ে
জলদি জলদি চলো—
মুখে খই ফুটিয়ে
আমরা খুইয়ে ফেলেছি সময়

রাজা উজির যাকে যেমন মারতে হয় মারো—
কিন্তু মনে রেখো, ময়দান জুড়ে
আকাশ মাথায় ক'রে চাই
সারিবদ্ধ

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস···

ডানায় ভর দিয়ে
আমার ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লাগা
শব্দগুলো
গন্ধে গন্ধে উড়ে এসে বসুক একবার
মাঠের নবান্নে

শুনেছি এর ঘাড়ে ও, তার ঘাড়ে সে।
শুনেছি সাদা-ভূত কালো-ভূত
শুনেছি ভূতের বেগার
আর কড়ির পাহাড়
শুনেছি জগদ্দল পাথরের কথা

ও ভাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কে
হাপড়ের ওঠাপড়ায়
ফোঁস ফোঁস করছে আগুন
ও ভাই, দাঁড়িয়ে কেন
নেহাইতে রক্তের মতন লাল,
গনগনে লোহা

আমি সাড়াশি নিয়ে বাগিয়ে ধরি
আর তুমি বিশ্বাসের তালে তালে
ঘা দাও

সময় যায়
যা করতে হবে
জলদি জলদি
সব জলদি জলদি করো ॥

ভালবাসার মুখ

আমার যাওয়া
আর না যাওয়ার মাঝখানে
দোল খাওয়া একটা সময়

নিচে তাকিয়ে দেখি সবাই
যে যার জায়গায়
স্থির হয়ে আছে

আমার মামা
আর না মামার মাঝখানে
একটা সংশয়

সেখানে তাকিয়ে দেখি
কী আশ্চর্য
আমার ভালবাসার মুখ

যা রয়েছে, দেখ
তাকে বাতিল ক'রে দিচ্ছে
যা নেই ॥

তোমাকে দরকার

তোমাকে আমার এখন খুব দরকার
বাইরেটা তছনছ হচ্ছে, দেখ
উল্টোপাল্টা হাওয়ায়

মাঝে মাঝে যেমন ক'রে
তুমি গুছিয়ে দাও
আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া টেবিল

যেমন করে বার ক'রে আনো
অসম্ভব সব যায়গা থেকে

আমার জরুরী দরকারের
উধাও হওয়া কাগজ

যেমন করে ছেঁড়া কাপড় জুড়ে জুড়ে
রঙীন সুতোয়
আমাকে বানিয়ে দাও ফুলতোলা বাহারে কাঁথা

তেমনিভাবে আমি চাই
তুমি আমার এই ছেঁড়াখোঁড়া
নিরুদ্দিষ্ট বল্লাহীন কথাগুলোর ড্যামা ধ'রে ধ'রে
যেখানে যার থাকার
সেখানে তাকে বসিয়ে দাও

বাইরেটা তছনছ হচ্ছে উল্টোপাল্টা হাওয়ায়
তুমি এখন কোথায় ?

চীরবাসে বীর

কবিতাকে পারি আমিও পরাতে পোশাক
খোপদুরস্ত ছন্দে চোস্ত মিলে
পেতে পারে যাতে দস্তুরমত হুঁকো সে
যেকোনো সময় মজলিশে মহফিলে।

আমার ভাবনা বেড়ায় না গায়ে ফুঁ দিয়ে
কাটায় না দিন ফুর্তিতে মজা লুটে
সেজে ফিটফাট টেরি-কাটা ফুলবাবুটি
ফুলে ফুলে মধু খায় না সে খুঁটে খুঁটে।

আমি নিশ্চল, গর্জে ওঠে না কামান
পুরু হয়ে তাতে স্বপ্নের জং ধরে
থামে নি যুদ্ধ, বদলেছে শুধু অস্ত্র
মানুষের হয়ে মানুষের মন লড়ে।

পল্টনে এসে শিখিয়েছ যারা, তাকাও।
পতাকা আমার উড়ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে
কবিতা আমার পদাতিক···কাঁধ মিলিয়ে
পা ফেলে জোয়াল তালে তালে চারিপাশে।

উলিঝুলি বেশ, তবু কী অসীম সাহসে
কঠিন আঘাত প্রাণপণে যায় হেনে
পরিপাটি কাজ নয় কো বীরের ভূষণ
বীরত্ব দিয়ে লোকে যোদ্ধাকে চেনে।

আমার কবিতা আমি মিশে গেলে মাটিতে
রবে কি রবে না, তাতে গেছে ভারি বয়ে
আমার কবিতা লড়ে সম্মুখ সমরে
দিতে হলে দেবে প্রাণ, পিছোবে না ভয়ে।

যা থাক কপালে, পবিত্র এই পুঁথিতে
চিরশান্তিতে ঘুমোবে আমার কথা
জেনো, এখানেই মিলবে বীরের সমাধি
যাদের মাথার মণি ছিল স্বাধীনতা॥

পাহাড়ে গা তোলে গোলাপ

পাহাড়ে গা তোলে গোলাপের মঞ্জরী,
কাছে এসো, বুকে বুক বাঁধো সুন্দরি!
কানে কানে বলো ভালবাসি ভালবাসি
বাঁধভাঙা সুখে আমি হই বানভাসি।

দানিয়ুবে দেয় গা এলিয়ে দিনমণি,
কী পুলকে জলতরঙ্গে জাগে ধ্বনি,
তোমাকে দোলাই বুকে নিয়ে, তাই দেখে
সূর্যকে নদী দোল দেয় থেকে থেকে।

কুলোকে যতই করুক না টিক টিক
বলুক যতই আমি ঘোর নাস্তিক!
বুকে মুখ রাখি, হৃদ্‌স্পন্দন শুনি···
গুরু হয়ে যায় বোধন; জ্বালাই ধুনি॥

ভিয়েতনামের কবিতা

স্বপ্ন

তে হান

ভাঙলে স্বপ্ন তুমি যে-কে সেই
সুদূরে
দেয়ালের গায় ঠিক্‌রোয় রোদ—
সকাল।
উদয় অস্ত ডুবে থাকি আমি
কাজে
রাত্রে আমার হৃদয়ে আসীন
তুমি।

দিনমানে আমি বাস করি
উত্তরে
রাত্রির নীড় বাঁধি আমি
দক্ষিণে।
তুমি আর আমি যখনই যেখানে
থাকি
আমরা দুজনে পরস্পরের
কাছে।
দিন উজ্জ্বল স্বপ্নের ছোঁয়া
লেগে॥

ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়ে যায়…

ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়ে যায়, ফুরালো সময়—
ছেড়ে চলে যাই তারে আজ যারে দিয়েছি হৃদয়,
বিদায়, মধুরা
বিদায়, আমার অন্তরতমা
মনচোরা ছোট পাখিটি!

আকাশের কোলে সারা গায়ে চাঁদ ঢালে কুঙ্কুম,
আমাদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চোখে নেই ঘুম,
বিদায়, মধুরা
বিদায়, আমার অন্তরতমা
মনচোরা ছোট পাখিটি!

The flower petals fall away...
ইংরেজি তর্জমা থেকে বাংলা
অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পড়ে টুপটাপ শিশিরের ফোঁটা পাতাহীন ডালে,
সমানে অশ্রু গড়ায় তোমার আমার দুগালে,
বিদায়, মধুরা
বিদায়, আমার অন্তরতমা
মনচোরা ছোট পাখিটি।

একদা আবার খালি ডাল ভ'রে উঠবে গোলাপে,
কে জানে, হয়ত হঠাৎ দুজনে দেখা হয়ে যাবে,
বিদায়, মধুরা
বিদায়, আমার অন্তরতমা
মনচোরা ছোট পাখিটি।

হাতে মাত্র চোখের এক পলক সময়

ঝুলতে ঝুলতে একজন
হাত ফসকে
উল্টে পড়েছে রাস্তায়।

তার টিফিনের খালি কৌটোটা
মুখ খুলে
গেল গেল শব্দে গড়াতে গড়াতে
খোয়া ওঠা বড় বড় গর্তের একটাতে গিয়ে
পিল হল।

যেদিকে আওয়াজ
সব চোখ সেইদিকে।

পেছনে
ব্রেক কষার ঝাঁকুনি খেয়ে
থেমে গেছে আমাদের গাড়িটা।

উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি
প'ড়ে থ' হয়ে গেছে লোকটা।

স্টপে দাঁড়ানো স্টেটবাসের ড্রাইভার জানেই না
তার নাকের নিচে
যমদূতের মত ডান চাকায়
লোকটার ডান রগ ছোঁয়ানো।

ভয়ে চোখ বন্ধ ক'রেও
আমি দেখতে পাচ্ছি কণ্ডাক্টরের হাতে
টান টান হয়ে আছে ফাঁসির দড়ি

যতক্ষণ দুটো ঠুন ঠুন আওয়াজে
আমার হৃদ্‌স্পন্দন না থেমে যায়
ততক্ষণ

ছেলে গেছে বনে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে
উৎসর্গীকৃতপ্রাণ
বাংলাভাষী ও ভারতের বহুভাষাভাষী
বীর সৈনিকদের উদ্দেশে

সামনেওয়ালা ভাগো

বুকে বাঁধছে ঢাল যতই ছেড়ে যাচ্ছে নাড়ী
ভয় পেয়ে দেখাচ্ছে ভয়
পথে বসছে ঝাঁড়ি

ইষ্টনাম জপতে জপতে
হাতে ধরল খিল
হাতের ঠোঙা হাতেই রইল
মিঠাই নিল চিল

ঘোড়া টিপেছে গুলি ফুটেছে হাত ছুটেছে
মাভৈ
টিপসইয়ের যা নমুনা রে ভাই
তাতে তো ভয় পাবই

ভয় পেয়েছি বিষম ভয় পেয়েছি ভয় ভীষণ
আত্মারাম ছাড়তে চাইছে
খাঁচার ইস্—
টিশন

লাঠির আগায় ফুটো হাঁড়ি কাকতাড়ুয়া
মা গো
বাজল ঘণ্টা নড়ল নিশান চলল গাড়ি
সামনেওয়ালা ভাগো ॥

অদ্ভুত সময়

এ এক ভারি অদ্ভুত সময়।

পুরনো ভিতগুলো যখন বালির মত ভাঙছে
আমরা ভাইবন্ধুরা
ঠিক তখনই
ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি।

কে তার আস্তিনের তলায় কার জন্যে
কোন্ হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে
আমরা জানি না।
কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়।

অন্ধকারে চেরা ভিতগুলো যখন হিস্ হিস্ শব্দ করে
তখন মনে হয়
অদৃশ্য করাত দিয়ে কেউ আমাদের খুব মিহি করে কাটছে।

যখন
একসঙ্গে হাত মুঠো ক'রে দাঁড়াতে পারলেই
আমরা সব কিছু পাই—
তখন
বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে
চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে রেখেছি

তোমার ঘৃণার দিকে
আমি ফিরিয়ে রেখেছি
আমার ভালবাসার মুখ

যেখানে গতি বলতে শুধুই ঘূর্ণপাক
এগোনো মানেই দেয়ালে মাথা ঠেকে যাওয়া
সংগ্রামের আরেক নাম যেখানে নিজেকে ভাঙা

তুমি সেই অন্ধগলিতে দাঁড়িয়ে
বিপন্ন চোখের আগুনে চাইছ
আমাকে ভস্ম করে দিতে

আর আমি
তোমার অভিশাপগুলো লুফে নিয়ে
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি আমার শুভেচ্ছা

ভোরের আজানের মত
আমি গলা তুলে জানান দিচ্ছি
খোলা রাস্তার কোন্ মুখে
আমি তোমারই জন্যে দাঁড়িয়ে

হাত বাড়িয়ে রেখেছি—
অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েও
তুমি আমার হাত যাতে ধরতে পারো ॥

ছেলে গেছে বনে

(বসন্ত মৈত্র-কে)

১

রাম তো গেলেন বনে।
দশরথ বাপ
দুঃখ যা পেলেন মনে
ছ' রাত্রেই সাফ॥

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সাতকাণ্ড বানিয়ে
কী ক'রে গেলেন তরে কঠিন এ সংসারে বাল্মীকি!
আমি যদি লিখি,
নিয়তিকে করতে আজ্ঞাবহ,
মিথ্যে অন্ধ মুনিকে টানব না।

লেখা বলতে, মনে পড়ল, ছিল বটে একদা বাসনা
লেখক হবার।
শব্দবেধে ছিল দুরাগ্রহ।
(তখন তো আমারও কৌমার!)

রাম রাম, এ ছি!
মার্জনা করবেন, প্রভু, অধীনের এ অবিমৃশ্যতা।
শব্দবেধ—এই কথা
নিতান্তই মুখ ফসকে বলেছি।

জল ভরবার শব্দে বাণ ছুঁড়ে আমি নই ভুলক্রমে খুনী;
আমাকে দেয় নি শাপ
শোকগ্রস্ত কোন অন্ধ মুনি।

বুক খুলেই দেখাই না লোক ডেকে চোখের জলছাপ।
আমি নই স্ত্রীর বশ
ইক্ষ্বাকু বংশের সেই ভগ্নস্নায়ু দ্বিধাদীর্ণ মেনিমুখো রাজা।
মুখ বুঁজে সগৌরবে আমি বই কালের এ সাজা।

আমার যখন এল বানপ্রস্থে যাওয়ার বয়স—
ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।
আমি তবু পদাতিক, তাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিকি দ্রিমিকি—

কাছে এস রত্নাকর, দূরে হটো বাল্মীকি॥

২

কপালে ঝিন্ ঝিন্ করছে ঘাম।
সময় দাঁড়িয়ে আছে
মাথার ওপর তার ছিঁড়ে
যেন বন্ধ ট্রাম।

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
মুক্তির লড়াই লড়বে ব'লে
ছেলে গেছে বনে।

পাশের টেবিলে একটা লোক
একেবারে টুপভুজঙ্গ।
সোডার বোতলে আমি ঠিক রাখছি চোখ,
কিছুতেই মাত্রা ছাড়াব না।
পুরনো স্মৃতির সঙ্গ
নেব আজ ঝেড়ে ফেলে সব দুর্ভাবনা।

নাও যদি মেলে গাড়ি—
কাগজের নৌকো ঠেলে
জুতো হাতে হেঁটে যাব বাড়ি।

ঝরাতে ঝরাতে যাব সারা রাস্তা মাঠের শিশির,
বড় বড় ঢেউ তুলে যতই দেখাক ভয়
পাড়-ভাঙা নদী
ফিরে পেতে চাই সেই বাল্যের বিস্ময়,
যে রোমাঞ্চ অন্ধকারে যেতে হাতে-ঝোলানো লণ্ঠনে।

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।

পাবে না জেনেও কাল রাত-দুপুরে বন্দুক উঁচিয়ে
গাড়ি পুলিশ
সারা বাড়ি খুঁজে গেল তন্ন তন্ন ক'রে।
পেরিয়ে চল্লিশ
যে আগুন প্রায় নিবন্ত, ওরা তার তুলছে আঁচ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

এখনও মিছিল গেলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই রাস্তায়,
যে কোনো সভায় গিয়ে শুনি
কে কী বলে।
কেউ কিছু ভাল করলে দিই তাতে সায়।
সংসারে ডুবেছি, তাই জ্বালাই না ধুনি।

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।

অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্তপাখা
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
আমারই পতাকা॥

সকর্মী

দেখ্‌, বেটা
ওপর-ওপর চোখ
বুলিয়ে বাইরেটা

কী রয়েছে মূলে—
না ভেঙে, না খুলে
যা আছে যেমন
রাখা-ঢাকা
বিষয়ে না ডুবিয়ে নিজেকে
এও এক রকম ক'রে দেখা
যেতে যেতে
রাস্তা থেকে
কিছুর ভেতর কিছু
নয় যেন

এমনি ক'রে জানো
দেখ্‌, বেটা!
রং ঢং দিয়ে টানে
যেটা

কোন্‌টা ঠুন্‌কো
কোন্‌টা বা টেঁকসই—
যে নয় বিষয়ী
তার কিছুই আসে যায় না

এও এক রকম আয়না
ফোটাতে পারলেই
ব্যস্‌, খুশী

তার কাছে নেই
বাইরে ডানা-কাটা পরী
ভেতরে রাক্ষুসী—

তুই সকরী।
দেখ্‌, বেটা।
ওপর-ওপর চোখ
বুলিয়ে বাইরেটা॥

খেলা হবে

দেখুন আলকাতরানো দেয়ালগুলো
এখন চুনকালিতে ছয়লাপ।
মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান—
খেলা হবে খেলা।

ঝাপ্‌সা চোখে চশমা লাগান
দেখতে পাবেন হাড়হদ্দ।
একবার ফিন্‌কি দিলেই
সব লালে লাল।

পটাশ দিয়ে ফটাস্‌ হবে
ঘোড়া ছুটবে তেরে কেটে তাক
হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে
দেখাব আপনাদের বাইশ কোপের খেলা।

আর পাঁচ মিনিট। আর পাঁচ মিনিট।
মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান—
পড়ে যাবে আরও একটা লাশ।

খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা॥

মধ্যে যুদ্ধ

জানা ছিল নাম।
বয়সে এবং
মনে ছিল রং।

ধরে ফেলতাম
তাকে ইস্ আর
একটু হলেই।

ধরব বলেই
শূন্যে যে খোলা
করেছি একদা
পাখা বিস্তার।

হয় নি আলাপ।
দেখেছি এ ওকে
শুধু চোখে চোখে।

দিতে যাব লাফ—
কেন যেন হঠাৎ
টেনেছিল হাত।

ছেড়ে দিল ট্রাম।
তাকে ইস্ আর
একটু হলেই
ধরে ফেলতাম।

যুদ্ধের ত্রাসে
আলো নিবোলেই
সেই কবেকার
স্মৃতি উঠে আসে॥

লাগসই

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র বাস্তবিক ছিলেন না ঈশ্বর
তাঁকে ধরা যেত
মানুষের দুঃখ দেখলে হতেন কাতর
অতএব লোকে করত তাঁকেই পাকড়াও
এবং কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পেত
যে যেমন জানাত প্রার্থনা

তাও
পেলে পরে ভুলে যাবে মানুষ সে পাত্র না
প্রতিদানে ঢিল
ছুঁড়েছে সে সজোরে পাঁজরে

মুখটা ব্যথায় নীল
অতএব লেগেছিল ঠিক

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না ঈশ্বর বাস্তবিক ॥

হুস্‌হুট

বাবুমশায়
আপনি সায়েব
আমি আপনার বাবুর্চি

হয়ে গায়েব
পর্দায় পাছে
চৌপহর দিন চৌকায় আঁচে
খোদা জানেন
যা পুড়ছি

কর্ছি তৈয়ার
        ফরমাচ্ছেন যা

হুজুর, আমার মনোবাঞ্ছা
        পূরণ হয় না
                নিজের রান্নায়

আমার খানা
        বিবি বানায়

ঘরে যাবার আগে, হুজুর
        ভালো ক'রে হাত ধুচ্ছি॥

ধরাবাঁধা

আয়না আয়না আয়না
সবাই দেখে নিজেকে, কেউ তোমাকে দেখতে চায় না।

গলি গলি গলি
এই বললে বসে থাকব, এই বলছ চলি।

রোয়াক রোয়াক রোয়াক
তোমায় দেখে গ্যাসের আলোর রাত্তিরটা পোহাক।

রাস্তা রাস্তা রাস্তা
শুয়ে শুয়ে দেখছ বুঝি হাঁ-করা আকাশটা।

ছাদ ছাদ ছাদ
খুপের জন্যে টুকুর জন্যে বেঁধে আনো তো চাঁদ॥

চর্যাপদ থেকে

১

কায়া তরু ; তার পাঁচখানি ডাল।
অধীর চিত্ত, অন্তরে কাল।
লুই বলে, মহাসুখের প্রমাণ
পাবে, কয়ো সদ্‌গুরু সন্ধান।
সুখ ও দুঃখে যখন এ ভবে
মৃত্যুই ধ্রুব , সমাধি কী হবে ?
এড়িয়ে ছন্দোবদ্ধ নিগড়
শূন্য পক্ষ করে থাকো ভর।
ধ্যানস্থ হয়ে দেখেছি এ দুই
প্রাণায়ামে ব'সে বলছেন লুই॥

২

ভবনদী বয় গম্ভীর খরবেগে—
মাঝে নেই থই , দুই পাড়ে কাদা লেগে।
চাটিল বেঁধেছে তাতে ধর্মের সাঁকো
নির্ভয়ে পার হয় লোক লাখো লাখো।
মোহতরু চিরে পাটি জোড়া হল খাসা।
অদ্বয় দৃঢ় টাঙি নির্বাণে ঠাসা।
ডান-বাঁ হয়ো না সাঁকোটাতে চড়ো যদি
যেও নাকো দূরে, নিকটেই আছে বোধি।
চাটিল হলেন সকলের বড় সাঁই
তাঁকেই শুধাক যারা পার হতে চায়॥

৩

কাকে যে ধরেছি, ছেড়েছি বা কাকে ?
চৌদিক থেকে বেড় দেয়, হাঁকে।

আপন মাংসে হরিণ বৈরী।
শরসন্ধানে ভুসুক তৈরি।
খায় না হরিণ—না জল, না ঘাস।
জানে না কোথায় হরিণীর বাস।
হরিণী বলেছে, 'ও হরিণ, শোন্—
দূরে চলে যা রে, ছেড়ে এই বন।'
ছুটে গেল, দেখা গেল নাকো খুরও।
ভুসুকুর কথা বোঝে না যে মূঢ়॥

৪

দোয়ালো কাছিম, উপ্‌চে পড়ল কেঁড়ে।
গাছের তেঁতুল কুমিরে খেয়েছে পেড়ে।
শোন্ ওরে বউ, উঠোনেই ঘরদোর।
কর্ণাভরণ মাঝরাতে নিল চোর।
শ্বশুর ঘুমোয়, বধূ একা জেগে আছে—
কর্ণাভরণ চেয়ে নেবে কার কাছে ?
দিবাভাগে বধূ কাকের ভয়েতে চুপ।
রাতের বেলায় চলে যায় কামরূপ।
কুক্কুরীপাদ এ চর্যাগীতি গায়—
কোটির মধ্যে একের মর্মে যায়॥

৫

আলিতে কালিতে পথ গেছে ঠেকে।
কাহ্ন বিমনা হল তাই দেখে।
করবে কাহ্ন কোথা বসবাস—
যে মনোগোচর সেই যে উদাস।
তিন তিন বটে, তিন অভিন্ন
ভবসংসার পরিচ্ছিন্ন।

যারা যারা আসে ফিরে চলে যায়।
কাহ্নু বিমনা সে আনাগোনায়।
ঐ তো, কাহ্নু, জিনপুর ঐ—
অন্তরে তবু সাড়া জাগে কই॥

উর্দু থেকে

শহরিয়ার-এর দুটি কবিতা

১

এইমাত্র
একটা আওয়াজ ঢেউ দিয়ে গেল দরজায়
এইমাত্র
কানে কানে ফিসফিসিয়ে গেল একটা
এইমাত্র
একটা মিষ্ট গন্ধ হাত বুলিয়ে গেল আমার গায়
এইমাত্র
আমার ঘরে ঢুকেছিল একটা ছায়া

আর ঠিক তখনই
ঘুমের দেয়াল ধ্বসে পড়ল
ঠিক তখনই
সাঁই সাঁই ক'রে ছুটল হাওয়া॥

২

এই দিগম্বর অন্ধকারে নৈঃশব্দ্য ছাড়া কীই বা আছে
শুধু শূন্যতা, শুধু হাহাকার, শুধুই পিপাসা
এখানে যে জন্যে তুমি এসেছ

কোনো দামেই তা মিলবে না
সঙ্গে ক'রে যা এনেছিলাম
তাড়া না করলে তাও খোয়া যাবে
চলো, তাড়াতাড়ি চলো নিজের ঘরে

যেখানে দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করছে
যে দিন চলে গেছে
তার করাঘাত ॥

রুশ থেকে

ৎভারদভ্‌স্কির একটি কবিতা

যা জানবার আমি নিজে নিজে জানব।
আমার যা কিছু ভুল
আমি নিজেই বার করব।
সমস্তই আমি জানব মনপ্রাণ দিয়ে—
পরের যোগানো বাঁধাগৎ দিয়ে নয়।
এ থেকে ভাল কিছু হবে না
—হাস্যকর আত্মপক্ষসমর্থনে আমি কি রকম ফেঁসেছি।
দয়া ক'রে আমার অন্তরপুরুষকে চোখে চোখে রেখো না,
আমার কানে মন্ত্র দেবার কোনো দরকার নেই ॥

তু-ফু-র ছটি চীনা কবিতা

বসন্ত দর্শন

একেবারে দলিতমথিত আমাদের দেশ,
শুধু নদী আর পাহাড়ই যা আগের মতন,
শহরে ভরে গেছে
বড় বড় গাছ আর বসন্তের উলুঘাসে।

আমাদের এমন দুঃসময় দেখে
ফুলেরাও চোখের জল ফেলছে,
লোকে তাদের প্রিয়জনদের ছেড়ে যাচ্ছে দেখে
পাখিরাও দুঃখে কাতর।

এই তিনটি মাস
সমানে
জলে জলে উঠছে সাঙ্কেতিক ইশারার আলো,
এদিকে বাড়ির একটা চিঠিও
আজ সোনার চেয়ে দামী।
আর আমি মাথা চুলকোতে গেলেই বুঝি
পাকা চুলগুলো এখন এমন পাতলা হয়ে গেছে যে—
কাঁটা দিয়েও আর সামলানো যাচ্ছে না॥

গাঁয়ে ফিরে

১

সমতলে ঢ'লে পড়েছে অস্তগামী সূর্য,
পশ্চিমের তুলো মেঘ ক্রমেই লালে লাল হচ্ছে।
বেড়ার গায় কিচির মিচির করছে চড়ুই,
আর দীর্ঘ রাস্তা ঠেঙিয়ে এখন আমি বাড়ির দোরগোড়ায়।

বউ ছেলেমেয়েরা নীরবে চোখের জল ফেলে
আমাকে দেখে অবাক হয়ে ছুটে এল :
যখন সারা পৃথিবী লড়ছে
ঘরের মানুষ ঘরে আসা সহজ নয়।

বাগানের দেয়ালে দেয়ালে উঁকি দিচ্ছে পড়শীদের মাথা,
যেদিকেই কান পাতো
শুনতে পাবে হাসিমুখের সচকিত ফিসফাস।
রাত নিশুতি হলে মোমবাতির আলোয় আমরা বসি,
স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি
একদৃষ্টে চেয়ে দেখছি আমার প্রিয়জনদের মুখ।

২

এখন আমার পড়ন্ত বয়স, জীবনের বেশির ভাগই গেছে যুদ্ধে,
আজও ঘরে-ফেরাটা আমার কাছে খুব সুখের নয়।
আমার আদুরে ছেলেটা সারাক্ষণ থাকে আমার পাশে পাশে,
তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে আমাকে সে ছেড়ে
যায়।

আমার মনে পড়ে, যখন আমি রওনা হই
তখন ছিল নিদাঘ --
লোকে যখন ঠাণ্ডা খোঁজে, গাছের ছায়ার ধার দিয়ে হাঁটে,
পুকুরের ধার দিয়ে দিয়ে।
আমি যখন ফিরে এলাম, তখন রীতিমত শীত,
সাঁই সাঁই করছে উত্তুরে হাওয়া,

আমার এখন উদ্বেগের অন্ত নেই,
কিন্তু আমি সান্ত্বনা পাই যখন শুনি
মাঠের ফসল আমরা ঘরে তুলেছি, চোলাই শেষ,
শেষ দিনগুলোতে আমাকে সাহস দেবার মত
যথেষ্ট মদ আমাদের মজুত।

৩

আমাদের মোরগগুলো গলা কাটিয়ে
কী চিৎকারই না জুড়েছিল,

অতিথিরা আসার সময় কী মোরগ-লড়াই
আর পাখা ঝাপ্‌টানি ;
আমি যখন তাড়া ক'রে তাদের গাছে তুলে দিলাম,
তখনই আমার কানে এল পড়শীরা দরজায় ডাকছে।
চার-পাঁচজন বুড়োর একটা দল এল
দীর্ঘ পথযাত্রার জন্যে অভিনন্দন জানাতে—
তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি ক'রে উপহার।
আমরা সবাই মিলে ব'সে কাঠের পাত্রে
আমার জন্যে ওদের আনা মিষ্টি মদ ঢক ঢক ক'রে খেলাম।

ওরা বলল, 'নিরেস জিনিস।'
কেননা জোয়ারের ক্ষেতে এবার চাষ হয় নি।
সৈন্যদলে লোক ভর্তি কখনও শেষ হয় না।
ছেলেরা পুবদেশে গেছে ফৌজীদের সঙ্গে...
উত্তরে আমি বললাম : 'আমি তোমাদের একটা গান শোনাই·
কষ্টের দিনে তোমাদের সাহায্য পাওয়া
কী যে মধুর কী বলব...।'

গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার পর
আমি আকাশের দিকে তাকালাম।
তারপর এ-ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি
আমাদের সকলের চোখই জলে ভেজা॥

এরিখ ভাইনার্ট-এর একটি জার্মান কবিতা

পাথরকুচির গান

আমরা ছিলাম ঘুমন্ত হিমজমাট পাথর
শত সহস্র বছর ধরে ;
ভেঙে গেল ঘুম বারুদকাঠির কঠিন ছোঁয়ায়
বিকোলাম শেষে বাজারদরে।

পাষাণস্থলীতে গাইতির মুখে ছিটোয় আগুন
হাঁক দেয় কুলি হেঁইও-হেঁই,
অঞ্জলি ভরে নিয়েছি আমরা—দিয়েছি দু'হাতে
শরীরের স্বেদশোণিতে সে-ই।

ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ঢালে আমাদের পথের ধুলোয়,
দুরমুশ করে সমানে পিটে,
ফোঁটায় ফোঁটায় কপালের ঘাম মাটিতে শুকোয়
পাথরে থিতোয় খুনের ছিটে।

পায়ে চাকা বেঁধে গড়াতে গড়াতে বাঁধানো সড়কে
ছুটে যায় গাড়ি কাঁপিয়ে পাড়া,
তবু অহরহ অনুভব করি পাষাণহৃদয়ে—
যারা কাজ করে তাদের সাড়া।

একদা হঠাৎ হাজার পায়ের দৃপ্ত আওয়াজে
শুনি মিছিলের গর্জে ওঠা
মজুরেরা গায়, কণ্ঠে আমরা কণ্ঠ মেলাই
পায়ে মাথা কোটে আলোর ছটা।

ছুটে এসে লাগে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চোখের নিমেষে—
আগুনের ঝড়, ধোঁয়ার আঁধি ;

পথ ঢেকে যায় মাথার খুলিতে ; আমরা পাষাণ—
রক্তগঙ্গা জটায় বাঁধি।

ওরা খুঁড়ে খুঁড়ে আমাদের টেনে ওপরে ওঠায়
সামনে বাধার দেয়াল তোলে,
বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়,
দু'চোখ তীব্র ঘৃণায় জ্বলে।

মাথার ওপর ফের ওঠে ঝড়, অগ্নিবৃষ্টি !
বুকে করে রাখি বন্ধুদের,
এ পাষাণকায় বজ্রমুঠির প্রবল প্রতাপ
শত্রুরা দেখ পাচ্ছে টের।

পাষাণ এ প্রাণ ব্যথায় কাঁদছে, হবে না ব্যর্থ
মজুরের এই রক্ত ঢালা ;
কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াব আমরা—হে সাথী, হে বীর !
সমাধিতে পাব জয়ের মালা ॥

তিনটি পুরনো গ্রীক কবিতা

প্রেমগীতি

ওঠো, উঠে পড়ো, দোহাই তোমার, যাও
এ কী ঘুম, গলা ভেঙে গেল ডেকে ডেকে
কেন দেরি ক'রে আমার বিপদ ঘটাও
সে এসে হঠাৎ দুজনকে যদি দেখে ?

শেষকালে এই ছিল, হা আমার কপাল—
ধরা পড়ি যদি, দুজনেরই হবে খোয়ার

জানালায় দেখ আধফুটন্ত সকাল
পায়ে পড়ি, ওঠো, উঠে পড়ো, প্রিয় আমার

হতাম যদি হাওয়া

তুমি ব'সে আছ নির্জন উপকূলে
আমি যেন কোনো সমুদ্রচারী হাওয়া
কেবলি তোমার বুকের আঁচল তুলে
তাতড়াই যাতে হৃদয়টা যায় পাওয়া ॥

হতাম লাল গোলাপ

আমায় তুমি তুলবে জানলে
হতাম লাল গোলাপ
তোমার পাণিপ্রার্থী হতাম,
জীবনসঙ্গিনি।

লজ্জা এঁকে দিত অঙ্গে
আরক্তিম ছাপ
তোমার বুকে মুখ রাখতাম
যখন, হে রঙ্গিনি ॥

রাইনর মারিয়া রিল্‌কে-র

শরতের দিন

সময় হয়েছে, প্রভু। গ্রীষ্ম ছিল ভারি।
শঙ্কুপট্টে ছুঁড়ে মারো নিজের ছায়াকে।
মাঠে ছেড়ে দাও হাওয়া খেলুক বেচারী।

আজ্ঞা করো, ফল পুষ্ট হোক তরুশাখে ;
আর মাত্র দুটো দিন রোদ রাখো পুষে ;
তুলি বললে ফল পেকে হবে টুসটুসে,
পাঠাবে মধুর তন্ত্র গাঢ় মদিরাকে।

ঘর গড়া হবে নাকো—যে আজো হা-ঘরে,
এখনও যে একা, তাকে থাকতে হবে ব'সে,
ভাঙবে ঘুম, পড়বে বই, চিঠি লিখবে ক'বে
অস্থির হৃদয়ে ঘুরবে এ-মোড় ও-মোড়ে—

শুকনো পাতা গাছ থেকে পড়বে খসে' খসে' ॥

হেরমান হেস্‌সে-র

যৌবন যায়

ক্লান্ত নিদাঘ, মাথাটা পড়েছে ঢলে,
ভাসা-ভাসা তার জলছবি ডোবা জুড়ে ;
পথ বন্ধুর, ভয়াল ; শরীর টলে—
ছায়াঢাকা বনবীথি সে অনেক দূরে।

একা দলছুট ভীরু হাওয়া যায় বয়ে।
পিছনে আকাশ চোখ লাল ক'রে আছে
আলো পড়ে এলে ভরসন্ধ্যার ভয়ে
গুটি গুটি এসে মৃত্যু ঘেঁষবে কাছে।

পথ বন্ধুর, ভয়াল ; শরীর টলে—
ফিরে দেখি দূরে যৌবন হাত নেড়ে
বলে : এসো। তার দু'চোখ ভিজছে জলে।
সে আজ আমাকে চিরতরে যায় ছেড়ে ॥

দূরভাষ

এখনও অনেক দেরি বসন্তের গলায় ঝুলিয়ে দিতে মালা
জানি না অজ্ঞাতবাসে আর কতকাল করবে প্রতীক্ষা ফাল্গুন
আকাশ দু' হাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ, চোখে বিদ্যুতের জ্বালা
থেকে থেকে অন্ধকারে জ্বলে ওঠে জোনাকীর শরীরে আগুন।

আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র, জেনে রেখো, কাল নিরবধি
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের, পায়ের পাতায় লেগে লেগে
মাটি ভাঙে, কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায় নদী
আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই কলকল্লোলিত সে আবেগে।

তোমাকে যে কথা আমি বলতে গিয়ে হার মেনে ফিরে ফিরে আসি
কানে গুন গুন ক'রে বলা যেত যদি আমি হতাম ভ্রমর
এখন অনেক দূর থেকে একা মনে মনে বলছি : ভালবাসি --
তুমি শুনতে পেলে কোনো দৈববাণী ? অথবা আমার কণ্ঠস্বর ?

এ সংসারে দিনে রাত্রে দেহ বলে, মন বলো যখন যা চাই
প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা, করো সব-কিছুর যাচাই॥

খাঁচা-ছাড়া

লেখকের দল।
একদিকে জল
একদিকে দানা।
বসিয়ে খাঁচায়।
ওরা লেখা চায়।

খাঁচা ভেঙে তাই
মেলছি ডানা॥

নিশির ডাক নাটকের গান

আশার কপালে চন্দন দিলাম
চন্দন লাগল না
বন্ধুর হৃদয়ে বন্ধন দিলাম
বন্ধন থাকল না।
সারাটা দিন জুড়ে দেখলাম
রাতের হাতছানি
দিনের চোখে স্বপ্ন দিলাম
রাতের চোখে পানি
হাটে হাটে বেচলাম প্রদীপ
ঘরে সন্ধ্যা জ্বলল না।

যেদিকে হাত বাড়াই যখন
যেদিকেতে চাই
চোখে ঠেকে আঁধি-আঁধার
হাতে ঠেকে ছাই।
চোখের মণি জ্বেলে খুঁজলাম
সাপের মাথার মণি
চোখ বুঁজেই খুঁজে পেতাম
বুকের মধ্যে খনি।
জীবনে যার সন্ধান করলাম
সন্ধান মিলল না॥

বায়নাক্কা

গুড়গুড়ে পাখি এক
পুছে বাত নিয়ত
পাগুড়িতে ঢাক ঢাক
গুড় গুড় কী অত

বলে দাদা শুনে সব
ভুরু দুটো কুঁচকে
কত বড় বেআদব
ঐটুকু পুঁচকে

অবিশ্যি এও ঠিক
মাথা সাফ থাকলে
বেঁধেছেঁদে চারিদিক
রাখা চাই আগলে

নইলে তো ছেড়ে নাক
টাম-ডুম ডুম-টাক॥

ম্যাও

ওরা তো সব কাগুজে বাঘ
আমি বাঘের মাসী হে
আমার ওপর করলে রাগ
দেব না ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে !

নরম মাটি পেলেই আমি
শানিয়ে নিই নখ হে
মানবে না যে গৃহস্বামী
নেই কো তার রক্ষে।

দেহ ক্লান্ত, দুয়োরে খিল
ভাবছ দেবে ঘুম কি ?
তার আশা নেই, টপ্‌কে পাঁচিল
অ্যায়সা দেব চমকি !

কাণ্ডজে বাঘের পায়ের ধুলো—

আমারই এখন দিন হে

মিনির দলে আমিই হুলো

চিনে নাও দাগচিহ্নে ॥

ভিয়েতনামে শোনা একটি গান

একটু আগে তুমি ছিলে মাথার ওপর

আর

আমি মাটিতে।

মেঘ থেকে বজ্র খসিয়ে খসিয়ে

নিচে

লাল পিঁপড়ের মত

আমাকে তুমি দেখছিলে।

এখন

আমি তোমার মাথার ওপর

আর তুমি টান টান হয়ে

মাটিতে।

কৃমিকীটের মত তোমার মুখ

আমি নিচু হয়ে দেখছি ॥

দেখেশুনে

লেনিনগ্রাদ থেকে চলেছি স্তোক

চার মহাদেশ চাপিয়ে দুই বাসে

জানলা দিয়ে দেখায় বায়োস্কোপ

রোমাঞ্চকর দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে

পিছিয়ে যায় পায়ে লাগিয়ে চাকা
যৌথখামার দোকানপাট বাড়ি
উড়ছে নামছে মাথায় ক'রে পাখা
হেলিকপ্টার।
সমানে হাত নাড়ি।

চোখের কাছে হার মেনেছে ভাষা।
চার মহাদেশ সারাটা পথ যেন
দু'হাত দিয়ে ছড়াই ভালবাসা।

খুঁটিয়ে দেখি। হিসেব চাই। কেন ?
এই মাটিতে বুনেছি সব আশা॥

দেয়ালে লেখবার জন্যে

হাত জোড় ক'রে নয়, হাত মুঠো ক'রেও নয়।
পেতে হলে হাত লাগাতে হবে॥

ভেতরে যত নরম, বাইরে তত গরম॥

দিনে দিনে হয়, রাতারাতি হওয়ার নয়॥

ঘৃণা ফেলে, ভালবাসা তোলে॥

শ্রেণী থাকবে না, মানুষ থাকবে॥

জীবনের জন্যে মৃত্যু, মৃত্যুর জন্যে জীবন নয়

আরম্ভে দেশ, দুনিয়ায় শেষ॥

যে ভাগে সে ভাঙে।
যে লড়ে সে গড়ে॥

উঁচুকে নিচু নয়, নিচুকে উঁচু করো॥

পরেরটা খোঁচায়, নিজেরটা গোছায়॥

এক হলে পারি, একা হলে হারি॥

বাঁধলে জোট, বাড়বে জোর॥

টুটলে বাঁধন, বাড়লে মান।
তবেই হবে সবাই সমান॥

আগে পাও যা দাও।
পরে নাও যা চাও॥

কথার সঙ্গে মেলাও হাত।
তাহলে হবে কিস্তিমাত॥

কে বা কারা

কে বা কারা নিয়েছিল মাথার ওপর তার কেটে
কাজেই ছ-ঘণ্টা লেটে
যখন ডানকুনি ছেড়ে ধূধূ-করা মাঠে ঠা ঠা রোদে
থেমে গেল
ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত রাতজাগা দূরাগত ট্রেন
সামনে দেখি নৃশংস আমোদে
পথ আটকে হ্যা হ্যা ক'রে হাসছে দুষ্ট সিগন্যালের আলো

বাইরে তরজা, থেকে থেকে চলছে মুখখিস্তির চিতেন
গালে-কাটা-দাগ এক খেঁড়ু
কেবিনের দিকে ফিরে দেখাচ্ছে আঙুল
চাপান-উতোর দিব্যি লড়ে যাচ্ছে কুমেরু সুমেরু
সরু হচ্ছে মোটা আর সূক্ষ্ম হচ্ছে স্থূল

অন্য দৃশ্য কামরায় কামরায়
ক্ষিধেয় ভোচকানি লেগে বাচ্চারা কাতরায়
গরমে আনচান করছে থেমে-থাকা ট্রেনে
অসুস্থ অশক্ত বুড়োবুড়ি
কেউ বা ঘড়ির দিকে রক্তচক্ষু হেনে
করতে চাইছে সময়ের ওপর গা-জুরি

চারদিকে দেয়ালে ছাদে মোচড়ানো দোমড়ানো ভাঙা-চাছা
জলের বেসিন, ট্যাপ, আয়না, ডুম, সুইচ, হাতল
শূন্য ক'রে খাঁচা
মাথার ওপর থেকে হাওয়া হয়ে গেছে সব পাখা
হাতের নাগালে আছে রাখা
একমাত্র শিকল
হঠাৎ সারাটা ট্রেন ঝুঁকে পড়ল জানলায় জানলায়
কে বা কারা দিবালোকে
সটান ইঞ্জিন থেকে সরাচ্ছে হায়-হায়
সমানে ব্যাটারি
গালে যার কালো দাগ রাগে অগ্নিশর্মা সে বেচারা
এই নামে এই এসে ঢোকে

ডিউটি শেষ, জুতো থেকে খুলে ফেলে ফিতে
তিন তিনটি বন্দুকধারী ব'সে আছে পা তুলে বেঞ্চিতে
যে দল ডিউটিতে আছে
ধারাপাত শুভঙ্করী ইত্যাদিতে সকলেই ব্যস্ত ধারেকাছে

মিটে গেলে কাজকর্ম, দ্বিতীয় অঙ্কের
পালা শুরু হয়ে গেল দ্রুতগতি ট্রেনের কামরায়
এতক্ষণ পাওয়া যায়নি টের
সাজঘরে মেক্‌আপ নিয়ে ব'সে ছিল এত কুশীলব
দরজা খুলে ক্রমাগত আসে আর যায়

তারা সব
চলন্ত ট্রেনের ছাদে উঠে গিয়ে
ট্রেনের তলায় ঢুকে দেখাচ্ছে কসরত
খালি হাতে যাচ্ছে তারা বস্তা থলি সমানে যুগিয়ে
কি ম্যাজিক, মূষিকের পেট থেকে বেরোচ্ছে পর্বত

ছাড়িয়ে গঙ্গার পুল গন্তব্যে না পৌঁছুতে পৌঁছুতে
আবার ঘচাং ক'রে থেমে গেল ট্রেন
তারপর মাটিতে ঝুপঝাপ
গালে যাঁর কাটা দাগ তিনি কিন্তু দিলেন না মাটি ছুঁতে
দয়া ক'রে ধ'রে দিন তো ভাই
আমাকে বললেন

দুপুরে আপিসে পৌঁছে তিন অঙ্কে সাঙ্গ হল আমার ধরতাই ॥

নিয়ে যাব শহর দেখাতে

১

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষ
তার হাতে
মাত্র চার প্রহর সময়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

চোখের ওপর আর নয়
গাল বেয়ে
নেমে এসে বুকের পঞ্জরে
হাত দাও, কান রেখে শোনো
দেখ চেয়ে—
অগ্নিগর্ভ কালের গহ্বরে
স্পন্দমান
দেশ।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে॥

যা ছিল না সুস্পষ্ট কখনও,
শুধু ভাসা-ভাসা
যার স্থান
সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে
ভেঙে গিয়ে সে মেঘপুঞ্জ রাশি
জল হয় যদি—
ফলন্ত ফুলন্ত হয় মাটি,
মুক্তিযুদ্ধে
শিরায় শিরায় নাচে ওঠে রক্তনদী

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

জীবনকে সমানে সাধে আদরে-আহ্লাদে
ঘৃণা দিয়ে মৃত্যুকে ফেরায়,
কাঁধে দিয়ে কাঁধ, হাতে হাত বাঁধে
শতদলে ফোটাল একফুল
পার হয়ে জলস্থল ডাঙা-ডাঁটি
চড়াই-উৎরাই

শুইয়ে দিয়ে গা-শহরে বসানো পুতুল
জয় ক'রে দুঃখক্লেশ
কে করবে দেশজয়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষ
তার হাতে
মাত্র চার প্রহর সময়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

২

সামনে থেকে স'রে যাও,
উঠে ব'সো ময়লা-ফেলা রাস্তার ডাস্টবিনে—
দেয়ালে পা ফাঁক ক'রে চোখ-মারা তারকা-রাক্ষসি!
দোকানে শো-কেসে স্টলে সাজাও যা খুশি।
সুবেশে পকেটমার নারীমাংসলোভী বইপুঁথি
সামনে থেকে সরাও এক্ষুনি।
যেন মুখ দেখায় না রং-কানা
ভ্রাতৃবক্ষে হাত-রাঙানো খুনী।
অহল্যা পাথরে মাথা ঠুকে যার পা করেছ দু'খানা
কাস্তে ও হাতুড়ি
দেশ দিয়ে জাহান্নামে, হয়ে নিজে দুনিয়ার বার—
স'রে যাও, স'রে যাও এসো না সাক্ষাতে!

আমি যাচ্ছি শহর দেখাতে॥

সময়ের জালে

১

নিজের হাতের ঘড়ি
চব্বিশ ঘণ্টায়
মাত্র একবারই দেখি—

ন'টায়
ভোঁ বাজলে।

দিন কোথা দিয়ে যায়
রাত কোথা দিয়ে যায়
আমি খবরই রাখি না।

খবরের কাগজের পাতায়
সকাল হয়,
ময়দানে খেলা ভাঙলে
সন্ধ্যে।

যেতে যেতে
দুপাশের দেয়ালে আলসে ছাদে
লটকানো
আকাশের রকম রকম ছিট
রকম রকম ছাঁট।

ঢেউ-খেলানো টিনের গায়
চিড়বিড়িয়ে শিল পড়লে
এখনও
কী যে মজা হয়।

টেবিলে, জুতোর বাক্সে
উত্তরের অপেক্ষায়
চিঠির ডাঁই।
না লেখার অপরাধ
দু-একটা দীর্ঘশ্বাসে হালকা হওয়ার নয়।

মাছ ধরার জাদু দেখাত
যে হাত-কাটা লোকটা—
বর্ষার এ মরশুমেও,
মনে রেখো,
তাকে দেখা গেল না।

রাস্তার গর্তগুলো
ছোট থেকে বড় করতে করতে
এগিয়ে চলেছে সময়॥

২

বাড়িতে পায়েস হলে
জানতে পারি
আমারও একটা জন্মদিন আছে।

মাঝরাত্রে ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ শুনে
ধরতে পারি
পৃথিবীতে নতুন মানুষ এল।

আমার একটুও ভালো লাগে না
তবু শবানুগমনে
মাঝে মাঝে আমাকে যেতেই হয়—
নেহাত মুখরক্ষার জন্মে।

চেনা লোকদের টেনে নিয়ে গিয়ে
চায়ের দোকানে তুলি।
চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেখি
বরের গাড়ি
ফুল সাজিয়ে চলে যাচ্ছে।

যাক,
যা বলছিলাম
কী যেন বলছিলাম
ভুলে গিয়েছি।

কাল হঠাৎ মনে পড়ে যাবে
এক-বাস্ লোকের মধ্যে।
হুঁশ হলে দেখব
আমার নামবার স্টপ
কখন পেছনে ফেলে এসেছি॥

৩

গল্পটা অনেকক্ষণ থেকেই
বলব বলব করছি।

রড-ধরা একটা হাতে
একটা ঘড়ি
আমার চোখের সামনে
কেউ পরছিল কিংবা খুলছিল।

নামব ব'লে হাত টেনে নিতে গিয়ে
হঠাৎ ঠাহর হল

হাতটা আমার
এবং ঘড়িটা অদৃশ্য।

পাদানি থেকে ঘড়িটা উদ্ধার হল
সেইসঙ্গে
পেছনে পিন্ খাটিয়ে তোলা
একটা মেয়ের ছবি।

ঘড়িটা গেলে
আমি সময়ের হাত থেকে
বাঁচতাম।
ছবিটা পেলাম একেবারেই উপ্‌রি।

কেননা পকেট থেকে ঘড়িটা
ফেলে দিতে গিয়ে
ভুল ক'রে ছবিটাও সেইসঙ্গে পড়ে গিয়েছিল ব'লে—

ছবির কোনো মালিক পাওয়া গেল না।

এখন আমার কাজ বেড়েছে।
ন'টার ভোঁ-র সঙ্গে
ঘড়িটা
আর মেয়েদের মুখের সঙ্গে
ছবিটা
মেলাতে গিয়ে সময়ের জালে
যেন আরও বেশি জড়িয়ে পড়ছি॥

কেয়াই

(দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী-কে)

সবাই সমান

যেখানে গেলে সবাই সমান হয়

'সব লাল হো যায়েগা' ব'লে
এক লাফে
সটান সেই জায়গায়

কাঁধ ধরাধরি ক'রে
পৌঁছুনো
এবং পৌঁছে দেওয়া গেল

রাবণের চুল্লীর সামনে লাইনবন্দী হয়ে
ধর্না দিচ্ছে
লালগাড়ি-পাশ-হওয়া
ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ
অপাপবিদ্ধের দল

নিশির ডাকে নিশান হাতে
যারা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিল
তারা এখন
সাড়ে তিন হাত জমির দখল ছেড়ে
আগুনের মুখে ছাই হওয়ার অপেক্ষায়

চোখ বন্ধ ব'লে
ওরা দেখতে পাচ্ছে না

মেঝে থেকে দেয়াল, দেয়াল থেকে ছাদ

শোয়ানো আর দাঁড়-করানো অক্ষরে

অঙ্গার দিয়ে লেখা অঙ্গীকার

ভুলব-না ভুলব-না ভুলব না!

একটা ক'রে যায়

লাইন একটু ক'রে এগোয়॥

বলির বাজনা

রাত্রে রেডিওতে যখন খবর বলে

কানে আঙুল দিয়ে থাকি

সকালে কাগজ এলে

ছুঁতেও ভয় করে

লাইনবন্দী চেনা মুখগুলো

একের পর এক

একের পর এক ভেসে ওঠে

আমার পুরনো সব বন্ধুর ছেলেরা

ছিল আমার নতুন বন্ধু

সিগারেট আমিই এগিয়ে দিতাম

যাতে তারা ছলছুতোয়

আমাকে একা ফেলে উঠে যেতে না পারে

ছেলেধরার দল

নাকের কাছে ফুল শুঁকিয়ে

ফুসলে নিয়ে চলে গেছে

ওদের বলি দেবে ব'লে

এখন যারা কবিতা শোনাতে আসে
তাদের কবিতা আমি শুনতে চাই না
যারটা শুনতে চাই
কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
এখন সে শবসাধনায় উ

লালবাড়ির ভেতর থেকে আসছে
হায়নাদের হাড়ভাঙার শব্দ
ঘুমের মধ্যে আমি চমকে চমকে উঠছি
কালো গাড়িগুলো থেকে
ঘষে ঘষে তোলা হচ্ছে চাপ চাপ রক্ত
হরিণবাড়িতে পাগলাঘণ্টি
বেজে চলেছে বেজে চলেছে বেজে চলেছে

একদল বাইরে থেকে ওসকাচ্ছে
একদল ভেতর থেকে ভাঙছে
বলির বাজনায় আর জয়জোকারে
রক্তমাখা খাঁড়াগুলো

উঠছে আর পড়ছে
উঠছে আর পড়ছে ॥

মাধ্যিখানে চর

মধ্যিখানে চর

এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন
এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন
ভাঙছে আর ভাঙছে

বলেছিল কবর দিতে
যারা খুঁড়ছিল
সেই কবরেই পেছন থেকে তাদের ঠেলে দেওয়া হল

বলেছিল দেশ বরবাদ
পরে দুনিয়াটাকেই ছেঁটে ফেলে দিল

ধরা পড়বার ভয়ে
সারা রাস্তা 'চোর চোর' ক'রে ছোটার পর
সিন্দুকের লাখবেলাখে
গোয়েন্দা-সিরিজে ফাঁস হয়ে যায়
হাতসাফাইয়ের কলকাঠি

গড়বার দল নয়
একটা ভাঙবার চক্র
নামাবলী গায়ে দিয়ে ভক্তদের ভোলাচ্ছে

মধ্যিখানে চর
তার আড়ালে ব'সে রয়েছে
কোন্ সে সওদাগর ?

বন্ধুরা কোথায়

কাঁধের গামছাগুলো হাতে নিয়ে
একটা দল
গুম্ হয়ে ব'সে

পথ
এখন এক অন্ধগলিতে এসে ঠেকে গেছে

শহীদের স্মৃতি রাখতে শহীদ হওয়া
খুনের বদলে খুন
এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না

যারা মৃত্যুর সওদাগর
পাখি-পড়ার মত ক'রে তারা বোঝাচ্ছে
হয় মারো নয় মরো
এগোবার পথ তারাই প্রশস্ত করেছিল
এখন ফেরবার পথে
তারাই কাঁটা দিচ্ছে

আমার সেই বন্ধুরা কোথায়
আমি জানি না
পাছে কোনো অকল্যাণ হয়
তাই কাউকে জিগ্যেস করি না
দেখে ফেললে না চেনার ভান করি

যারা শত্রুকে একঘরে না ক'রে
বন্ধুকে শত্রু করছে
যারা সংগ্রামের সাথীদের
আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়ে
মৃত্যুর গুণগান গাইছে—

সেই শয়তান চক্রটাকে এবার
যেখানে পাও খুঁজে বার করো
ফাঁক ভরাট করো
ভাঙাকে জোড়া দাও
তাহলেই সোনার কৌটোয় কালো প্রাণভোমরা গুলো
বুক ফেটে দাপিয়ে দাপিয়ে মরে যাবে

কাঁধের গামছা কোমরে বেঁধে
শ্মশান থেকে উঠে এসো
ভালবাসায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে
জীবনটাকে ধরো

যৌবনের কেরাই দিয়ে
হারিয়ে-যাওয়া নতুন বন্ধুরা আমার
সমানে জিতে নাও সৃষ্টির পিঠ

যাবার আগে যেন দেখে যাই
মেঘভাঙা রামধনু

ঢেলে সাজা পৃথিবীর বুকে
যেন শুনতে পাই
ভোরবেলার আজান ॥

একুশে ফেব্রুয়ারী

বাক্সটার মধ্যে রাজ্যের জিনিস তালাবন্ধ—
চাবিটা
আমি সারা ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছি।
ছোট্ট মেয়েটা হঠাৎ
আমার মুঠোটা খুলে দিয়ে বলল,
এই তো!
এতক্ষণ তো তোমার হাতের মধ্যেই ছিল!

দ্রুতি

গভীর রাত
তীব্র গতি
খড়ের গাড়ি
গরুর চোখ
গাছের গুঁড়ি
খড়ির দাগ ॥

শব্দে আর নিঃশব্দে

দেয়ালের মধ্যে দেয়াল।
নখের মধ্যে ছুঁচ।
ঘুমের মধ্যে জেরা।
শয়তানের দল জানে—
বোমার শব্দে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে।

রক্তের মধ্যে রক্তবীজ।
চোখের মধ্যে স্বপ্ন।
বুকের মধ্যে বিশ্বাস।
শয়তানের দল জানে না—
নিঃশব্দে সমস্ত কিছু ফাঁস হ'য়ে যাচ্ছে

আজকের গান

ডাকে বান,
ভাঙে বাঁধ—
হাতে দাও হাত, ভাই
হাতে দাও হাত।

দলে দলে কাঁধে কাঁধ

চলো একসাথ, ভাই

চলো একসাথ।

ছলেবলেকৌশলে

সমানে লোভের হাত কে বাড়াস ?

সম্মুখে

পথ রুখে

কে দাঁড়াস ?

শয়তান,

সাবধান !

ডাকে বান,

ভাঙে বাঁধ—

হাতে দাও হাত ভাই।

দলে দলে কাঁধে কাঁধ

চলো একসাথ ভাই।

যে আজো পিছিয়ে আছে

তাকে ডেকে আনো কাছে

যে রয়েছে নিচে প'ড়ে

তুলে আনো হাত ধ'রে।

আনো দিন হাতুড়ির

আনো দিন কাস্তের

খাদ্যের শিল্পের শিক্ষার স্বাস্থ্যের।

নতুন দিনের আলো লেগে করে ঝলমল ঝলমল

বঞ্চিতদের সাধআহ্লাদ।

আমাদের লাখো লাখো পদভরে টলমল টলমল

নড়ে ওঠে বনিয়াদ।

পার হতে বাকি শেষ লড়াইয়ের ময়দান
দুর্দমনীয় বেগে চলো হই আগুয়ান।

ডাকে বান,
ভাঙে বাঁধ—
হাতে দাও হাত ভাই।
দলে দলে কাঁধে কাঁধ
চলো একসাথ ভাই॥

আলোয় অনালোয়

দিনের আলো নিবে যাবার পর
ঘরের মধ্যে আলোগুলো জ্বলে উঠল।
কোণাঘুপ্চিতে গা-ঢাকা দেওয়া অন্ধকার
আমাদের কারো পাশে
কারো পেছনে
উঠে এসে গা ছুঁয়ে দাঁড়াল।

আলো-অন্ধকারের এই ইতরবিশেষ
আমরা আদৌ গায়ে মাখি নি।

এমন সময়
গন্‌গনে লোহার গায়ে জল লাগার মত
পাড়া জুড়ে এক আচম্বিত শব্দে
সমস্ত আলো একেবারে ফস্ ক'রে নিবে গেল।

অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।
একজন উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের দরজাটা
বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।
টর্চ জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ এর ওর মুখের ওপর ফেলা হল,
দেখা গেল প্রত্যেকেই উসখুস করছে।

আলোয় আমরা পৃথক পৃথক থেকেও
কেমন মিলেমিশে এক হয়ে ছিলাম ;
অন্ধকার আমাদের একাকার ক'রে
পরস্পরের কাছছাড়া ক'রে দিল।

ঘরজোড়া স্তব্ধতায় শোনা গেল
ইতিহাসের এক ভীষণ চিলচিৎকার ॥

কড়াপাক

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল মহাপাজী
গাজী
আর খাইবার
তার জুড়িদার
এ কালাপানির দুই কালসাপ
বিলকুল সাফ।

আকাশে ভো-কাটা, মাটিতে সাবাড়
স্থাবার

রাস্তায় খান্ খান্ কে
গড়াগড়ি যায় ট্যাঙ্কে।

ঠ্যাঙানির চোটে
ফেলে পল্টন আগেভাগে ছোটে
পশ্চিমা বীর মিঞাজী
নিয়াজি।

চীন-মার্কিন টের পাক
এ কঠিন ঠাঁই—কড়াপাক॥

পুবহাওয়ার গান

হাওয়া দিচ্ছে হাওয়া
স্রোত বইছে স্রোত
এপার থেকে ওপার
ভেসে যাচ্ছে ফুল।
যারে ফুল পুবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা—
আমার ফুল লাল টুকটুক
নাচতে নাচতে যায়
আমার ফুল ডাঙায় উঠে
যেখানে মাটি রক্তে ভেজা।
যারে ফুল পুবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা—
গুণবতী ভাই আমার,
মন কেমন করে
কবে দেখা হবে ও ভাই,
কবে আসবে ঘরে।
যারে ফুল পুবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা—

এই ফুল লাল টুকটুক
ভাইয়ের পুব আকাশে ফুটুক
ঝুরু ঝুরু খেলুক হাওয়া
খুলে দাও জানলাদরজা।

যারে ফুল পুবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা॥